শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি।

সকল কাজেরই একটা উপক্রম আছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, একাধিকবার উপক্রমের পর কার্য্যের সুচারু সাধন হইয়া থাকে। সকৃদুপক্রমের ফলাফলের উপর নির্ভর করিলে, এ জগতে অনেক বড় বড় কাজ অদ্য পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ দেখিতে পাইতাম না।

যাঁহারা আজ কাল বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইলে সঙ্কুচিত চিত্তে পরিহার প্রার্থনা করেন, সেই সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট দুই একটি কথা বলাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। উপরি লিখিত কথাগুলি অবশ্যই তাঁহারা বিদিত আছেন। লিখিবার উদ্যম মাত্রেই যে কেহ বঙ্কিমচন্দ্র কি কালীপ্রসন্ন হইয়া বসিবেন, ইহা প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না এবং চেষ্টা করিলেও, সকলেই যে "সুলেখক" হইতে পারিবেন, এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে, সাধারণের নিকট [illegible]লেরই অনেক সময় কিছু কিছু বলিবার থাকিতে পারে; তাহা প্রায়শঃ মৌখিক বলিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে না, ঘটিলেও তাহা সচরাচর নিতান্ত ক্ষণস্থায়ীই [illegible]। সুতরাং যাহা বক্তব্য, হাতে কলমে তাহা বিজ্ঞাপিত করাই সুবিধা। সকলেই, চেষ্টা করিলে, "সুলেখক" না হউন, গদ্যেই যে

"শিক্ষিত"

ভাবরূপে সাধারণের পরিজ্ঞানার্থে পত্রস্থ করিতে পারেন, ইহা এক প্রকার ধ্রুব। এবং তন্নিমিত্ত উপক্রম করা সুশিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের নিকট লোকে অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকে; তাঁহারা কোন্ বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করেন, ইতর-সাধারণ উহা জানিবার নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। সদাশয় ইংরাজ-রাজের কৃপায়, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নানাদেশের নানা জাতির যে সকল জ্ঞানরাশির অধিকারী হইয়াছেন, দেশস্থ সাধারণ ব্যক্তিবর্গের সমীপে উহার প্রচার করা কি বিধেয় নহে?—অজ্ঞতা বা কুশিক্ষা প্রভাবে দেশে ও সমাজে যে সকল কদাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বা হইতেছে, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শাস্ত্র এবং ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির আলোচনাদ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উহা দূরীকরণার্থে লেখনী ধারণ করা কি কর্ত্তব্য নহে?—এবং যদি ইহা বিহিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনের ভাব সুন্দররূপে লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিতে যত্ন করা কি উচিত নহে?

বর্ত্তমানে অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের একটা বড়ই কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা শিক্ষাবিভাগের বহির্ভাগে বিচরণ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেই পূর্ব্বাধীত বিদ্যা একেবারে ভুলিয়া যান। ইতর সাধারণ লোকহইতে তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করা [illegible]র দায় হইয়া উঠে। কেন এমন হইল?

বাইবেলে একটি উপকথা আছে। কোন প্রভু তদীয় ভৃত্য-ত্রয়কে যথাক্রমে পাঁচটি দুইটি ও একটি মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বিদেশ চলিয়া যান। প্রথম ভৃত্যটি তাহার পাঁচটি মুদ্রাদ্বারা ব্যবসায় করিয়া আর পাঁচটি লাভ করিল। দ্বিতীয় ভৃত্যও ঐরূপে আর দুইটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিল। তৃতীয় ব্যক্তি, প্রভুর মুদ্রা প্রভুকে ফিরাইয়া দিতে হইবে ভাবিয়া, তদ্বর্দ্ধনার্থে কোনও চেষ্টা করা বিধেয় বিবেচনা করিল না। যথাসময়ে প্রভু প্রত্যাগত হইলে আপন আপন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রথম ব্যক্তি দশটি, দ্বিতীয় চারিটি এবং তৃতীয় একটি মুদ্রা আনিয়া, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিল। প্রথম ও দ্বিতীয়ের প্রতি প্রভু নিরতিশয় প্রীত হইয়া যথোচিত পুরস্কার বিধান করিলেন; পরন্তু তৃতীয় ভৃত্যকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক দূর করিয়া দিলেন।

আমাদের বর্ত্তমান-কালীন শিক্ষিতের দলও প্রভুর তৃতীয় ভৃত্যের সম-শ্রেণীস্থ নহেন কি? তাঁহারা বিদ্যালয়প্রদত্ত জ্ঞান সাধারণ মধ্যে প্রচার রূপ ব্যবসায় দ্বারা পরিপুষ্ট করেন না, তাই সুধীসমাজকর্ত্তৃক তিরস্কারের ভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট এই মাত্র নিবেদন,—তাঁহারা একটু আলস্য পরিত্যাগ করুন; একবার অধীত বিদ্যার আলোচনা করুন; এবং দেশ-মধ্যে উহা প্রচার করিয়া উপার্জিত শিক্ষিত কলঙ্ক অপনোদন করুন।

গ্রন্থার্জ্জিত-জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়-নির্গত ব্যক্তি-বৃন্দই যে কেবল এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, এমন নহে। "শিক্ষিত"

পর্য্যায়ে এমন সকল ব্যক্তিকেও ধরা গিয়াছে, যাঁহারা নিজের ভূয়োদর্শনের ফলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মানব সাধারণকে শিখাইবার ও বুঝাইবার উপযুক্ত অনেক বিষয় শিখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, যাঁহাদের চরণসমীপে বসিয়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বরপুত্র, সংসার, সমাজ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের সমীচীন মীমাংসা শিক্ষা করিতে পারেন। অর্ব্বাচীন সমাজের উপদেশার্থ, উল্লেখিত প্রাচীনগণের লেখনী ধারণ করা কি উচিত নহে ?

এক্ষণে দেখা গেল যে লিখিবার জন্য, অর্থাৎ মনের ভাব সুন্দররূপে লেখনীমুখে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত, চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিলে কিছু সহজ বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। মানব মাত্রেই আমরা নিজ নিজ মনের ভাব বাগ্‌যন্ত্র কিম্বা লেখনীযন্ত্রের সাহায্যে আশৈশব প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা ছাত্রাবস্থায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাংবৎসরিক, বৈশ্ববিদ্যালয়িক প্রভৃতি অগণন পরীক্ষাসূত্রে উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের অত্যুদার ব্যবহার করিয়াছেন; সম্প্রতি সংসার-মঞ্চে উকীল, হাকিম, কেরাণী ও শিক্ষক ইত্যাদি বিবিধ বেশে ঐ দুই যন্ত্রেরই সহায়তায় বিচরণ করিতেছেন, এবং এতদ্দ্বারা মনের নানা ভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইহার নিমিত্ত প্রয়াসের কথা কেন ? কথাটা এই যে, যাহা সাধারণের সমালোচনার অধীন করিয়া পত্রস্থ করিতে হইবে, তাহা যেরূপে একটু সংযত করিয়া ও বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়, তৎপক্ষেই চেষ্টার প্রয়োজন; কেন না বিষয়কর্ম্মে

বা চিঠিপত্রে. আমরা ভাষার সংযত ও বিশুদ্ধ ভাবের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর সচরাচর পাইয়া উঠি না।

কিন্তু আরও একটি কথা, একটু গুরুতর কথাই বক্তব্য রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে বাগ্‌যন্ত্র ও লেখনীযন্ত্রের পরিচালনার কথা উল্লেখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই, মাতৃভাষার সঙ্গে অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ থাকে না। বাল্যে বিদ্যালয়ে এবং সম্প্রতি বিষয়কর্ম্মে ইংরাজী ভাষারই চর্চ্চা করাতে, তাঁহাদের অধিকাংশই নিজের মাতৃভাষার আলোচনায় নিতান্ত পরাঙ্মুখ; ইংরেজী ভাষা যেন তাঁহাদের চিত্তটা যুড়িয়া রাখিয়াছে, স্বদেশের ভাষা যেন স্থিতিবিরোধিতা নিয়মে উহার কাছেও ঘেঁসিতে পারিতেছে না। "বিবাহ-বিভ্রাটের" মিঃ সিংহের ন্যায় প্রকৃতই তাঁহাদের বাঙ্গালা বলিতে যেন কষ্ট হয়, এবং যাহা বলেন, তাঁহা যেন মনে মনে ইংরাজী হইতে তরজমা করিয়া এবং শতকরা নিরনব্বইটি ইংরেজী শব্দের বুক্‌নী দিয়া বাহির করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংবাদ পত্র পাঠ করিবেন ইংরেজীতে, পুস্তকাদি পাঠ করিবেন ইংরেজীতে, পরস্পর আলাপ করিবেন ইংরেজীতে, এমন কি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট চিঠিখানাও লিখিবেন ইংরেজীতে। সুতরাং ইহাঁরা বঙ্গভাষায় কোন কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে তাহা পারিবেন কেন? যখন তাঁহাদের মনে সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করিবার উপযোগী কোন ভাবের উদয় হয়, তাহা অগত্যা ইংরেজীতেই ব্যক্ত হইয়া থাকে, বঙ্গভাষায় উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা উঁহারা খুঁজিয়াই পান না।

উপরি লিখিত প্রথার পক্ষে প্রায়শঃ একটি যুক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ আমাদের রাজা; শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কাজ কর্ম্ম প্রায় অধিকাংশ স্থলে রাজভাষাতেই সম্পাদন করিতে হয়; এবং রাজপুরুষগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে হইলে, উত্তমরূপে রাজভাষা লিখনের ও কথনের অভ্যাস করা আবশ্যক; অতএব ইংরেজী ভাষার সম্যক্ আলোচনা করাও আবশ্যক। আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ভাষাটারও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা রাখা কি সঙ্গত নহে? শিক্ষিত ব্যক্তিগণই যখন দেশের মুখপাত্র, তাঁহারা যদি মাতৃভাষার পরিচর্য্যা না করেন, তবে ইহা আর কাহার নিকট আশ্রয় লাভ করিবে? বিশেষতঃ তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে ইদানীন্তন কালে যাঁহারা বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ইংরেজী ভাষায় বিশেষ কৃতী এবং অনেকেই রাজপুরুষগণের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ। কাব্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সাধারণ সাহিত্যে ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, প্রভৃতির কথা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফলতঃ, ঐ যে মাতৃভাষানুশীলনে ঔদাস্য, উহা দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক মহতী জড়তার পরিসূচক ভাব মাত্র; নচেৎ যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা একটু মনোযোগ দিলেই এতদ্বিষয়ে ন্যূনাধিক কৃতিত্ব-লাভ অবশ্যই করিতে পারেন।

অনেকে এই বলিয়াও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে,

দেশীয় ভাষায় পাঠোপযোগী গ্রন্থ বা পত্রিকা আদৌ নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ বলিলে এক প্রকার মানিয়া লইতাম; বর্ত্তমানে বঙ্গ ভাষার অনেক পুষ্টিসাধন হইয়াছে, এখন সে কথা স্বীকার্য্য নহে কিন্তু তথাপি বঙ্গভাষার অনেক অভাব আছে, এবং সেই সকল অভাব দূর করিবার জন্যইত শিক্ষিতগণকে আহ্বান করা যাইতেছে। যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এই অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে বঙ্গভাষার যুগান্তর সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি ঐরূপ যুক্তি ধরিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা ভারতবর্ষের অধুনাতন প্রচলিত ভাষাবলীর মধ্যে আজ এক অতি প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিত কি ? তাই নিবেদন, ভবিষ্য বংশের শিক্ষিতগণ যাহাতে মাতৃভাষায় পড়িবার জিনিস আরও অধিক পরিমাণে পান, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গভাষায় লিখিবার জন্য অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কিরূপে উহা করিবেন, তাহা স্বয়ংই বাছিয়া লইতে পারেন। তথাপি এতৎ সম্বন্ধে দুই একটি কথা তাঁহাদিগের বিবেচনাধীন করা যাইতেছে :—

(১) প্রাচীন ও আধুনিক বিখ্যাত বঙ্গীয় লেখকগণের রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইদানীং যে সকল গ্রন্থকারের রচনা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্বীয় রচনা গঠিত বা মার্জ্জিত করিতে হইবে।

(২) বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ করা কি চিঠি

পত্র লেখা, এবং রাজকার্য্য পরিচালনা পক্ষে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য্য ; কিন্তু তদিতর বিষয়ে মাতৃভাষারই অনুশীলন কর্ত্তব্য। * কথাবার্ত্তায় তবু শিক্ষিত সম্প্রদায়, অবিমিশ্র না হউক, বঙ্গভাষা কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু চিঠিপত্রে আদৌ উহার প্রচলন নাই। পিতা পুত্রের নিকট, এবং পুত্র পিতার নিকট পত্র লিখিতেও "মাতৃ" ভাষা বর্জ্জন করেন, ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের কথা কি হইতে পারে ?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিনলিপি (diary) ও স্মারক লিপি (note-book) প্রভৃতি লিখিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজীর পরিবর্ত্তে ঐ সকল বঙ্গভাষাতেই লেখা উচিত। চিঠি পত্রাদি অপরের গোচরীভূত হয়, কিন্তু ঐ গুলি কেবল নিজের নিকটেই থাকে, সুতরাং শিক্ষানবিশের পক্ষে ঐরূপে রচনাভ্যাসে কোনরূপ সঙ্কোচের ভাবও আসিতে পারে না।

(৩) বিবিধ ভাষার গ্রন্থরাজির অংশবিশেষ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা উচিত। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে রচনা শিক্ষার উহা একটি সুগম উপায়। বিশেষতঃ, নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞানরাশি হইতে ভাবসংগ্রহ পূর্ব্বক মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধন করা, ভাষার এই ক্রমিক উন্নতির অবস্থায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অতি প্রধান কর্ত্তব্য। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির যে অভাব

* সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহোদয় "সাহিত্য-পরিষদে"র সভ্যগণকে পরস্পর আলাপ ও চিঠি পত্রাদিতে বঙ্গভাষার ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে পরিষদের সভ্যগণ কতদূর মনোযোগ দিতেছেন, জানা যায় নাই।

বর্ত্তমানে অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা ঐ রূপেই পূরণ করিতে হইবে, এবং অনুবাদ অভ্যাস থাকিলে তৎপক্ষে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

(৪) রচনাবিশুদ্ধি এবং শব্দসম্পত্তি লাভের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করা আবশ্যক। সংস্কৃত অতি জটিল ভাষা এবং সম্যক্ আয়ত্ত করা কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিয়দ্দূর প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই কিছু না কিছু সংস্কৃতালোচনা করিতে হইয়াছিল; এবং যদিও বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কি তৎপূর্ব্বেই তাঁহারা সংস্কৃতের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি, জড়তা পরিহার করিয়া পূর্ব্বাধীত গ্রন্থগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই, বোধ হয়, অনেকে সাধারণ সংস্কৃত বুঝিতে পারিবেন। এইরূপে কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু আয়াস স্বীকার করিলে, তাঁহারা শকুন্তলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রসাস্বাদন করিয়া পরিশ্রমের সফলতাও অনুভব করিতে পারিবেন। সংস্কৃত না জানাতে অনেকে সামান্য পত্রখান লিখিতে গিয়াও যে কত বর্ণাশুদ্ধি, শব্দের অপপ্রয়োগ প্রভৃতি অমার্জ্জনীয় দোষ ঘটাইয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

(৫) প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, উদ্যমমাত্রেই কৃতিত্বলাভ করা দুঃসাধ্য। উদ্যমকারী যে সকল রচনা করিবেন, তাহা দুই একবার নিজে সংশোধিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান্ লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখান উচিত। অতিশয় শালীন-

শীলতা কিংবা প্রভৃত আত্মনির্ভরতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় রচনা অপরকে না দেখাইয়া, অভিনব রচয়িতা যেন সহসা উহা বিবর্জ্জিত বা প্রকাশিত না করেন ; কেননা নিজের দৃষ্টিতে যাহা অবিসংবাদিভাবে মন্দ বা ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের চক্ষুতে তাহা তদ্বিপরীত প্রতীয়মান হইতে পারে।

প্রবন্ধাদি লিখিতে গেলে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন—ভাব ও ভাষা ; প্রবন্ধকে একটা চেতন পদার্থ ভাবিয়া ভাষাকে উহার শরীর ধরিলে ভাবকে উহার প্রাণ বলিতে হইবে। ভাষারূপ শরীরের উপাদান বিষয়ে বরং মতামত প্রদান করা যাইতে পারে, এবং এতৎপ্রবন্ধে ঐ বিষয়েই দুই একটি কথা বলা হইল, কিন্তু ভাবরূপ প্রাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বড়ই কঠিন। ভাব দ্বিবিধ,—প্রতিভা-জাত এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ। হৃদয়ে যার সত্তা থাকিলে ভাষা আপনা আপনি বহির্গত হয়, সেই ভাব প্রতিভা-সম্ভূত। উহা যাঁহার আছে, সেই প্রতিভাশীল ব্যক্তিকে লিখিবার নিমিত্তও অনুরোধ করিতে হয় না, ভাষা বিষয়েও উপদেশ দিতে হয় না। তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য, তাঁহার ভুল ভ্রান্তিও আর্য্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। পরন্তু যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভূয়োদর্শনের ফলে এবং গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা ভাব-সংগ্রহশীল, সেই সকল ব্যক্তিই এতৎ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

জগতে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ ভাব সৃষ্টি করিয়া যান, অপর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহা আয়ত্ত করিয়া আলোচনা ও আন্দোলন

দ্বারা লোক মধ্যে উহার প্রচার করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন আচার্য্য ঋষিগণের ঋণ স্বাধ্যায় অধ্যাপনা তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা আছে, ভাবশাস্ত্রেও তদ্রূপ প্রতিভার ঋণ আলোচনা ও প্রচার কার্য্য দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা স্মরণ রাখিয়া, যথাশক্তি এতৎ-কার্য্যে এই সাহিত্য-সেবকের সঙ্গে যোগদান করেন, ইহাই প্রার্থনা।

[সাহিত্য-সেবক, ফাল্গুন ১৩০২।]

আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা সমালোচনা।

এমনও দিন গিয়াছে যখন নব্যবঙ্গ, সংস্কৃত গ্রন্থ কি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পরিপোষণ করিতেন। সম্প্রতি সে ভাবের তিরোধান হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে, অনেকেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। দেশের লোক বুঝিয়াছেন, সংস্কৃত চর্চ্চাই স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অবগতি এবং পৈতৃক সনাতন ধর্ম্মের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, তৎকরণে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ। অর্থকরী ইংরেজী বিদ্যার অনুশীলনেই সর্ব্বদা তাহাদিগকে যত্নশীল দেখা যায়।

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত ষোল আনা পণ্ডিত দেখা যাইত এখন তেমন পণ্ডিত আর দেখিতে পাই না। কালধর্ম্মবশতঃ লোকের ধারণা শক্তির হ্রাস হইতেছে ইহাও উহার অন্যতম কারণ বটে; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে আমাদের অনেক পুত্র থাকিলে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ সচরাচর তাহাকেই আমরা সংস্কৃত শিক্ষার্থে উৎসৃষ্ট করিয়া থাকি। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ অপর সন্তানগুলিকে, অর্থহেতু

ইংরেজী শিক্ষায় নিয়োজিত করি। এমন ব্যক্তিদিগের দ্বারা পণ্ডিতবর্গের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশা করা বৃথা।

বুদ্ধিমান্ ছাত্র যে সংস্কৃত শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করে না এমনও নহে। কিন্তু আজকালকার সংস্কৃত শিক্ষার যে প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত তাহাতে অনেক বুদ্ধিমান্ ছাত্রকেও পরিশেষে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাই সংস্কৃত শিক্ষার রীতি; তাহা প্রশস্তই বটে। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রণালীতে যে গলদ প্রবেশ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বঙ্গদেশে মৌলিক ব্যাকরণ অধীত হয় না। পাণিনীয় প্রভৃতি ব্যাকরণের খুঁজ খবরও অনেকে রাখে না। কলাপ ব্যাকরণকে সম্পূর্ণাবয়ব মৌলিক ব্যাকরণ বলিতে পারি না।* অজ্ঞ রাজাকে অনধিক আয়াসে সংস্কৃতের মোটামুটি জ্ঞান দিবার জন্যই এই ব্যাকরণের সৃষ্টি। সুতরাং কলাপ ব্যাকরণে মোটামুটি মাত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মাইবার জন্য, পরিশেষে, পরিশিষ্ট, পঞ্জী, কবিরাজ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিতে হয়। এ সমুদয় একত্র করিলে মৌলিক পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রায় দ্বিগুণ আয়তন হয়, অথচ একমাত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ পড়িলেই, অধিক না হউক, অন্ততঃ সেই জ্ঞানটুকু অবশ্যই হইবার কথা।

তারপর ব্যাকরণের ভাষা। অবশ্য, প্রথম শিক্ষার্থীকে যে

* পূর্ব্ব-বঙ্গের চতুষ্পাঠীর ছাত্র ও অধ্যাপকমহোদয় দিগকেই লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল; তাই কলাপ ব্যাকরণেরই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনেকটা না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হইবে তাহা অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রথমতঃ, বঙ্গভাষার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকার ন্যায় ব্যাকরণের অধ্যয়ন দ্বারা শব্দ, ক্রিয়া, কারক, সমাস, প্রভৃতির সাধারণ একটু জ্ঞান জন্মাইতে অতি অল্প বয়স্ক শিশু-দিগেরও অধিক দিন লাগিতে পারে না; অথচ "সিদ্ধো বর্ণ সমাম্নায়ঃ" প্রভৃতি সূত্রের অর্থ বোধ না হউক, অন্ততঃ অন্বয় বোধ অনায়াসেই হইবে এবং এতদ্দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সূত্রাদির অর্থ পরিগ্রহ ও আয়ত্তীকরণের অনেক সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার এই রীতি প্রচলিত নাই। সন্ধি ও চতুষ্টয় পর্য্যন্ত কেবল শুকবৃত্তিই অবলম্বিত হয়, তারপর যদি ছাত্রের অদৃষ্টে থাকে আখ্যাতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে। কলাপ পড়িয়া পাঁচ বৎসরের ন্যূনে অতি বুদ্ধিমান্ ছাত্রকেও ব্যাকরণে পারদর্শী হইতে সচরাচর দেখা যায় না। পাণিনীয় ব্যাকরণ যে এতদপেক্ষা অনেক অল্পতর সময়েই আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ; অথচ ইহাতে একটা মৌলিক ব্যাকরণ অধীত হয়। বিশেষতঃ কলাপ পড়িয়া যখন ছাত্রগণ সাহিত্যাদি পড়িতে যায়, তখন মল্লিনাথ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের টীকাতে কলাপের সূত্রাদির নাম গন্ধও না দেখিয়া হতাশ হয়, এবং নূতন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকরণান্তরের সূত্রাদি পুনরভ্যস্ত করিতে হয়। গোড়া হইতে পাণিনি পড়িলে এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

এই গেল ব্যাকরণের কথা। দর্শন স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়নেও

ঐ রূপ গলদ। ন্যায় ছাড়া বঙ্গদেশে আর কোনও দর্শন প্রচলিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জন যে অনেক দিন হইল হইয়াছে, তাহা আর উল্লেখ করিয়া দুর্দ্দশার স্মৃতি দ্বারা মনকে বৃথা ক্লিষ্ট করিতে চাই না। ঐ যে সন্ধ্যা উপাসনার সময় গোটা কতক মন্ত্র, শ্রাদ্ধাদির সময় পঠিত কতকগুলি বচন, তাহাও সাপের মন্ত্রের ন্যায় অর্থ গ্রহণ না করিয়া উদ্গীর্ণ করা হয়; ইহাতেই আমাদের বেদজ্ঞান পর্য্যবসিত। বেদের অন্তের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তেরও অন্তর্দ্ধান এবং বেদাঙ্গেরও অঙ্গহীনতা হইয়াছে। যে বলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, যাহার মহিমায় আর্য্যগণ অসার বিষয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেই বেদান্ত ও উপনিষদাবলীর আলোচনা চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ফল তর্কাদি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করাতেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অধঃপতন ঘটিয়াছে; তাঁহারা বিষয়লোলুপ হইয়াছেন এবং বিধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের দুরবস্থার কথা আর কি বলিব? মূলগ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি সঙ্কেতাবলম্বনে নিরক্ষরপ্রায় গণকগণের দ্বারা ইহার চর্চ্চা হইতেছে। * আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সৌভাগ্যক্রমে

* এই সকল কথা এই পত্রের বিগত সংখ্যায় 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' সমালোচনার্থে লিখিত প্রস্তাবে আমাদের মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত এম, এ মহোদয় বিশদভাবে দেখাইয়াছেন।

বৈদ্য মহোদয়গণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতেই এই ঘোরত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনেও উহার বিলোপ না হইয়া একটু উন্নতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আগম শাস্ত্র হাতুড়েদের হাতে পড়িয়া প্রায় পট তুলিয়াছে। আরও কত শাস্ত্র যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

ব্যাকরণ ব্যতীত আজ কাল যাহা কিছু আলোচিত হয় তাহা কেবল স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায় এবং কিয়ৎ পরিমাণে সাহিত্যগ্রন্থ। স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদায়ক, কেননা তৈলবটাদিতে কিছু কি প্রাপ্তির সম্ভাবনা; সুতরাং তাহার আলোচনাদিও হইয়া থাকে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মূল প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থাদি উপেক্ষি হইয়া থাকে। ঋষিপ্রতিম রঘুনন্দন ভাগ্যে একখানা সংগ্র গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাই আমাদের স্মৃতি ব্যবসায়ীদের কে একটু পসার চলিতেছে; নতুবা যে কি হইত বলা যায় না সংহিতাদির আলোচনা বর্ত্তমানে সম্যক্ হয় না বলিলেও অন্যা হয় না। পুরাণ শাস্ত্রও কিছু একটু অর্থদায়ক; কেননা পাঠকতা করিতে গেলে এবং শিষ্যাদি রাখিতে গেলে পুরাণে অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহাও বড় বেশী লোককে পড়িতে দেখা যায় না। ন্যায়শাস্ত্রের দুর্দ্দশা ও বিড়ম্বনার কথ এক মুখে আর কত কহিব? গৌতমাদি ঋষির মৌলিক সূত্রা দির চর্চ্চা অতি অল্প মাত্রই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কি কুক্ষণে ফাঁকি ও পাত্ড়া রূপিণী দুইটা রাক্ষসী আসিয়াছিল, যে যাঁহার

ন্যায়গহনে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই হয় অর্দ্ধ পথ হইতে পলায়ন করেন, নয় একেবারে মাথাটা হারাইয়া আইসেন; দৈববশে ক্বচিৎ কেহ রাক্ষসীর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

বর্ত্তমানে কাব্যাদির এবং তৎসঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তবে কি পণ্ডিত মহাশয়েরা কাব্যামৃত রসের আস্বাদ করিতে ভালবাসেন?

ইংরেজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের যাহা কিছু চর্চ্চা হয় তাহা কেবল সাহিত্যেরই। স্কুল-কলেজে সাহিত্য গ্রন্থাদি অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। তাই পণ্ডিতির আশায় অনেকে কাব্যের প্রতি মন দিতেছেন এবং অলঙ্কার না জানিলে সাহিত্য চলেনা, সুতরাং তাহারও কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিয়া থাকেন। কঠোর ও নীরস ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে কোমল মধুর কাব্যের কিছু কিছু আলোচনা হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভয় হয় পাছে কাব্যের রসে বিভোর হইয়া অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ণ মাত্রায় বিলাসী হইয়া পড়েন। যেরূপ কালমাহাত্ম্য দেখা যায়, ইহা যে না ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবেইত হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।

উপসংহারে আমাদের এই বক্তব্য যে আজ কাল ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যেরূপ হ্রাস দেখা যায় তাহাতে শঙ্কা হয় পাছে বা ক্রিয়া কাণ্ডেরই লোপ হয়। এই রূপ হ্রাসের কারণ এই যে

ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে সংযম-ধন নহেন, সেই "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ" প্রভৃতি নীতি ভুলিয়া জীবনসংগ্রামে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা কালের ধর্ম্ম এবং সমাজের দুর্ভাগ্যের হেতু সন্দেহ নাই; অতএব সংস্কৃত শিক্ষার রীতির জটিলতা ও বিষয়ের গভীরত্ব একটু কমাইয়া, যাহাতে অল্প বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ভাষা এবং বিষয়ে একটু প্রবেশ লাভ করিতে পারে তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়া অধ্যাপক মহোদয়গণের কর্ত্তব্য। যে সকল ছাত্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর ও বিষয়াবলীর দুরূহত্বে ভীত হইয়া সুখ-পাঠ্য ইংরেজী বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, বিষয় ও প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে তাহারা সংস্কৃতই অধ্যয়ন করিবে এমন আশা করা যাইতে পারে। সেরূপ পরিবর্ত্তন কি উপায়ে করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপাধ্যায় মহোদয়েরাই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন, আমরা তৎকরণে অনধিকারী। তবে এই মাত্র বলা যায়, যে এক্ষণে আর ফাঁকি পাতড়ার দিন নাই; সুতরাং এই সকল আগাছা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে মৌলিক দর্শন, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থাদি আলোচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্য পুরাণ ইত্যাদি অধ্যাপিত হয় তাহা করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই ধর্ম্ম বিভ্রাটের সময়, ছাত্রগণ যাহাতে স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রথমতঃ নিজে বুঝিয়া, পশ্চাৎ উন্মার্গ প্রস্থানোন্মুখ সামাজিক ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতে পারে, অধ্যাপক মহাশয়েরা উহাদিগকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিবেন। বর্ত্তমানে প্রয়োজন, যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একাধারে নৈয়ায়িক, শাব্দিক, স্মার্ত্ত, ধর্ম্মোপদেষ্টা সমস্ত হইতে হইবে; এ ছাড়া

ব্রাহ্মণকৃত্য যাজনিক ক্রিয়া কাণ্ডেও পারদর্শী হইতে হইবে। সুতরাং কেবল ন্যায়-ব্যাকরণের ফাঁকি পাত্ড়ায় দিন কর্ত্তন করিলে অবশেষে দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। বিচারমল্লের বিজয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য অনুশোচনা করি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে নানা শাস্ত্রের সারজ্ঞ হয়েন না এবং তাঁহাদের নিকট যাইয়া ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিরা যে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

[সারস্বত পত্র, ২৬শে বৈশাখ ১২৯৯।]

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। *

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্ব্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"

কোন কাব্যের টীকাদি লিখিবার পূর্ব্বে প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায়শঃ মম্মটভট্টের এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। উক্ত কবিতাতে কবির কাব্য লিখিবার প্রয়োজন এবং পাঠক সাধারণের উহার আলোচনা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কবি কাব্য লিখেন,—(১) "যশসে"—অমর কীর্ত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত; (২) "অর্থকৃতে" ধন লাভের জন্য;—উদাহরণ স্থলে "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" বলা হয়। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের কবিযশঃস্পৃহা বড়ই বলবতী ছিল, অথচ তদনুরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না. তাই দরিদ্র কবি ধাবককে প্রচুর ধনদান পূর্ব্বক রত্নাবলী নাগানন্দ প্রভৃতি প্রণয়ন করাইয়া "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। † কবির কাব্য লিখিবার তৃতীয় প্রয়োজন—"শিবেতরক্ষতয়ে" অমঙ্গল বিনাশনের নিমিত্ত; যেমন ময়ূরভট্ট সূর্য্যশতক প্রণয়ন

---

* শিলং সাহিত্য সভার সমালোচনী শাখার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম, এ কর্ত্তৃক পঠিত হইত। জন্মভূমি-সম্পাদক।

† এই উদাহরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেরই কিন্তু সন্দেহ আছে।

করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই গেল কবির কথা। তারপর পাঠকের কথা। উঁহারা কাব্যালোচনা করিবেন,—(১) "ব্যবহারবিদে"—লোকাচার পরিজ্ঞানের নিমিত্ত; যেমন মৃচ্ছকটিক নাটক পড়িলে রাজা শূদ্রকের সময়ে (প্রায় ৩০০ খৃঃ পূঃ) ধর্ম্মাধিকরণে কিরূপ বিচার প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায়। (২) "সদ্যঃ পরনির্ব্বৃতয়ে" কাব্যপাঠমাত্রেই কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়, তাহার অনুভবের নিমিত্ত। বিশেষতঃ (৩) "কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"—শ্রুতি প্রভৃতি আমাদিগকে প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন, পুরাণেতিহাস বন্ধুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু পতি হিতৈষিণী প্রণয়িনী যেরূপ উন্মার্গগামী ভর্ত্তাকে অবসর বুঝিয়া নানাছাঁদে বিনাইয়া কোমল মধুর স্ফুটাস্ফুট বচনাবলীদ্বারা ধীরে ধীরে সৎপথে আসিতে উপরোধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কাব্যও পাঠকের মনে নানা রস ও ভাবের অবতারণা করিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া মহৎ চরিত্রের সাধু আদর্শ প্রভৃতি অলক্ষিত ভাবে হৃদয়-পটে মুদ্রিত করিয়া, অল্পাধিক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীর কোনটি অবলম্বন পূর্ব্বক ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার তদীয় মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহা পাঠ করিলে পাঠকেরই বা কি ফল লাভ হয়, তাহা প্রসঙ্গক্রমে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। উপস্থিত, ভট্টিকাব্য কাহার রচিত—ইহাই আমাদিগের প্রধানতঃ আলোচনার বিষয়। ভর্ত্তৃ-

হরিনামক কবি এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে দুইজন কবি ভর্ত্তৃহরি নামে খ্যাত ছিলেন * বলিতে হইবে;—(১) শৃঙ্গার-শতক্, নীতি-শতক এবং বৈরাগ্য-শতক এই কোষকাব্যত্রয়ের গ্রন্থকার এবং (২) ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, দুই জন ভর্ত্তৃহরি কল্পিত না হইয়া একজন কবিকেই শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলা যায় না কেন? এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত দুই প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা যায়। প্রথম বাহ্য; কোষ-কবি ভর্ত্তৃহরি এবং ভট্টি-কবি ভর্ত্তৃহরির ভিন্ন ভিন্ন জীবনাখ্যায়িকা লোক সমাজে প্রচারিত আছে। দ্বিতীয় আভ্যন্তর; তাঁহাদিগের রচিত কাব্য মধ্যে বিভিন্ন ভাব ও রুচি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শৃঙ্গার-শতক প্রভৃতি রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি রাজা ছিলেন। কথিত আছে, তিনি—ভারতের হারুণ-অর্-রশিদ—রাজা বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ছিলেন। মধ্য যুগের রাজন্যবর্গের যেমন রীতি ছিল, তিনিও তদ্রূপ বিলাসী রাজা ছিলেন। কথিত আছে, একদিন কোন সন্ন্যাসী একটি ফল আনিয়া রাজাকে বলিলেন যে এই ফল ভক্ষণকারী ব্যক্তি চিরযৌবনসম্পন্ন হইবেন। ভোগ-বিলাস-পরায়ণ স্ত্রৈণ রাজা, নিজে না খাইয়া, সেই ফল রাণীকে উপহার দিলেন। রাণীর এক উপপতি ছিল, তিনি তাহাকে দিলেন। ঐ ব্যক্তির

* শব্দ শাস্ত্রের সম্প্রদায়-বিশেষ-গুরু, বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থ রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভর্ত্তৃহরি এই দুইজনের অন্তর্গত কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। জং সং।

অপর এক উপপত্নী ছিল, সে উহাকেই ফল অর্পণ করিল। সেই রমণীর আবার রাজার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ছিল, সে পরকীয়া ভাবের নিষ্কামত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকেই ফল প্রদান করিল। এইরূপে ফলটি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং অনুসন্ধানপূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সংসারে বীতরাগতাবশতঃ তৎক্ষণাৎ অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলেন। প্রবাদ—তদীয় নীতি-শতকের প্রথম শ্লোকে এই ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥"

এই ভর্ত্তৃহরির জীবনী অনেক পরিমাণে শান্তিশতককার শিহ্লন মিশ্রের * অনুরূপ। শৃঙ্গার, নীতি ও বৈরাগ্য শতকের উদ্দেশ্য ও ভাব প্রায় শান্তিশতকেরই ন্যায়। এমন কি, ভর্ত্তৃহরির অনেক কবিতা শান্তিশতকে অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়; উদাহরণ স্থলে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ইহাতে উভয় কবিই যেন সমস্বরে স্বীয় জীবনের পূর্ব্ব কাহিনী এবং তাৎকালিক ভাব জন-সমাজে বিবৃত করিতেছেন।

"যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং
তদা জ্ঞাতং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।

* শিহ্লন মিশ্রের জীবনী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনীর অবিকল অনুরূপ;—অধিক কি, উভয়কে একই ব্যক্তি বলিয়া যেন সন্দেহ হয়।

ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টি স্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥”

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের জীবনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি, পরম ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামীর পুত্র। তাঁহার অদ্ভুত শৈশব কাহিনী বাঙ্গালা ভক্তমালগ্রন্থহইতে উদ্ধৃত করা গেল—

“শ্রীল শ্রীধর স্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবত টীকা কৈল বিস্তারিত ॥
* * *
শাঙ্করী বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণা ব্যাখ্যান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধ মত বিলক্ষণ ॥
* * *
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণ গর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হইল দৃঢ় মতি ॥
হেন কালে নারী, পুত্র প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া ॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তিত, বালক এই কেবা রক্ষা করে ॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যেঠী-ডিম্ব।
চাল হতে প’ড়ে গেল বিনা অবলম্ব ॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হতে বাচ্ছা নিকলিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া ॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।

সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল ॥
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥
সেই শিশু, কালে মহা পণ্ডিত হইল।
ভট্টিনামে রাম-লীলা সাহিত্য রচিল ॥"

গ্রন্থকার নিজ কাব্যের উপসংহারে আত্ম পরিচয়স্থলে এই মাত্র বলিয়াছেন—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর সেন (?) নরেন্দ্র পালিতায়াম্ ॥"*

ইহাতে দেখা যায় যে, ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার বলভী-নগরাধিপ শ্রীধর সেন (?) ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করেন।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তদ্দারা উভয় কবির জীবনীতে বিলক্ষণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং উহাই উভয় কবি একই ব্যক্তি না হইবার যথেষ্ট প্রমাণ। † এই গেল বাহ্য প্রমাণ; আভ্যন্তর প্রমাণও দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে।

কোষকাব্যের রচয়িতা ভর্ত্তৃহরির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও, শৃঙ্গারশতকে আদি-রসের অযথা অনেক ছড়াছড়ি করিয়া উক্ত

* বলভী এক সময় ভারতবর্ষের মধ্যে সুসমৃদ্ধ রাজধানী ছিল, সেই সময়ের এবং তৎস্থলীয় রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। ভং, সং।

† উভয়ের আবির্ভাব-কালেরও বিলক্ষণ অন্তরায় রহিয়াছে। ভর্ত্তৃহরির অনুজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পরে শঙ্করাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক পরে ভট্টিকাব্যের পিতা শ্রীধরস্বামী জন্ম পরিগ্রহ করেন।

শতকের নাম সার্থক করিয়াছেন এবং স্বীয় রুচিরও বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টিকাব্যের রচয়িতা তদীয় প্রকাণ্ড গ্রন্থে অনতিস্থূল একটী সর্গে (একাদশে) মাত্র আদি রসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য বুঝা যায়;—প্রথম, সমস্ত রসের প্রধান আদি রস একটা মহাকাব্যের অঙ্গী না হইলেও অঙ্গরূপে থাকা আবশ্যক;* দ্বিতীয়, গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য শব্দশাস্ত্রের নানাবিষয়ক উদাহরণ-প্রদর্শন, তাই কাব্যমধ্যে আদি রসের উদাহরণেরও প্রয়োজন। টীকাকারও বলেন,—"মাধুর্য্যমপি কাব্যস্য গুণ উক্তঃ। ইতি তৎ প্রদর্শনার্থং লঙ্কাপ্রভাতবর্ণনমধিকৃত্য আহ।" এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে কবি অনেক পরিমাণে সংযত রুচির অনুসরণ করিয়া মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির অপেক্ষাও সমধিক প্রশস্য হইয়াছেন।

আর একটী আভ্যন্তর প্রমাণ দেখা যায়। কোষ-কাব্যের কবি ভর্ত্তৃহরি প্রগাঢ় শৈব ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-শতকে শিবার্চ্চনা-বিষয়ক শ্লোক-মালার একটীতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দ্দনে বা জগদন্তকারণে।
ন বস্তুতো মে প্রতিপত্তিরস্তি
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥"

* শৃঙ্গার বীর শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে। অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ।
—সাহিত্য-দর্পণ।

মহাকালাধিষ্ঠিত উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরের এবং সম্প্রতি অবধূতাশ্রমাবলম্বীর ইহা হইবারই কথা। কিন্তু ভট্টি কাব্যের গ্রন্থকার একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণবের সন্তান, তাঁহার অবশ্য বৈষ্ণব হওয়াই স্বাভাবিক এবং "রামলীলা-সাহিত্য" রচনা করিয়া তিনি ঘোরতর বৈষ্ণব ভক্তমাল রচয়িতারও প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। বিশেষতঃ টীকা-মুখে ভট্টীকাব্যের টীকাকার-গণ সমস্বরে স্বীকার করিয়াছেন যে, কাব্যের প্রথম শ্লোকে "সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্" এই বাক্য দ্বারা কবি স্বীয় ইষ্ট-দেবতাকেই স্মরণ করিয়াছেন।

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের নাম কি ছিল, তাহা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। টীকাকার জয়মঙ্গলের মতে গ্রন্থকারের নাম ভট্ট বা ভট্টি এবং কবির অনুকরণে তিনিও স্বকৃত টীকার নাম "জয়মঙ্গলা" রাখিয়াছেন।

তাঁহার টীকার উপক্রমণিকায় আছে—"শ্রীস্বামি সুনুঃ কবি র্ভট্টিনামা রামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার"। আবার পরি-সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন, "ইতি শ্রীস্বামিসূনোর্ভট্টমহাব্রাহ্মণস্য কৃতৌ" ইত্যাদি। বৈদ্য টীকাকৃৎ ভরতমল্লিক বলেন,—"ভর্তৃ-হরির্নাম কবিঃ শ্রীরামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।" কবি আপন গ্রন্থমধ্যে আপনার নাম কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই; অপর কবিগণ হইতে ইহাও তাঁহার এক বিশেষত্ব। বঙ্গানূদিত ভক্ত-মালেও * তাঁহার নাম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভক্তমালোদ্ধৃত

* মূল ভক্তমাল-গ্রন্থ দেখিবার নিমিত্ত বলবতী স্পৃহা সত্ত্বেও এ যাবৎ লেখকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই অনুমান হয় যে, যেহেতু পরম ভাগব
পিতা শ্রীধরস্বামী অনাথশরণ ভগবান্ শ্রীহরির উপরেই নবজা
শিশুর ভরণের ভারার্পণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে
তাহাতে কবির নাম "ভর্তৃহরি" হওয়াই স্বাভাবিক। শৈশবে "গ্রা
লোক" দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াতে তদীয় নামের প্রাকৃতাপভ্রং
হইয়া "ভট্টি" এই অদ্ভুত আকার ধারণ করাও নিতান্ত অস
নহে। অথবা, "কালে সেই শিশু মহাপণ্ডিত" হইলে 'ভর্তৃহ
ভট্ট' এই নাম ধারণ করিয়া, পিতা শ্রীধর স্বামী যেমন মাত্র 'স্বা
নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ, "ভট্ট" এই খ্যাতিতেই, বে
হয়, তৎকালে পরিচিত হইতেন এবং তজ্জন্যই তদ্রচিত কাব
'ভট্টিকাব্য' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কল্পনা দ্বা
জয়মঙ্গল ও ভরতমল্লিকের বিবাদের এক প্রকার সমন্বয় হই
পারিত, কিন্তু তাহাতে এক মহান্ অন্তরায় রহিয়াছে। সাহি
দর্পণে মহাকাব্য লক্ষণে আছে,—

"কবের্ব্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা। নামাস্য—
দর্পণ টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ (১৬
শকাব্দে) উক্ত কারিকার উদাহরণ স্থলে লিখিয়াছেন-
"কবিনামকং মহাকাব্যং যথা মাঘভারবিপ্রভৃতি; বৃত্তনাম
কুমারসম্ভবাদি; নায়কনামকং রঘুপ্রভৃতি; ইতরনাম
ভট্টিপ্রভৃতি।" ইহাতে জয়মঙ্গলের মত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইতেছে
তবে, কবির নামে নাম না হইলে, "ভট্টিকাব্য" এ
সংজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? এতৎ সম্বন্ধে কাব্যের পরিসমাপ

নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোক দ্বারা দুই প্রকার মীমাংসা কল্পিত হইতে পারে।

(১) "ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥

ইহাতে এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকার পণ্ডিত (ভট্ট) গণের পরিতোষার্থে কাব্য রচনা করাতে কাব্যের নাম "ভট্টিকাব্য" হইয়াছে।

(২) "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর সেন * নরেন্দ্র পালিতায়াম্।
কীর্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥"

এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, কাব্য-রচনার শ্রেষ্ঠতম ফল "কীর্ত্তি" আশ্রয়দাতা ভট্টারকের নামে উৎসর্গীকৃত হওয়াতেই 'ভট্টিকাব্য' এই নাম সিদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক, ভরত মল্লিকের মতই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া এতদ্দেশে গৃহীত হইয়াছে এবং ভর্তৃহরি নামক কবি ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভরতমল্লিকেয় মত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন টীকাকার জয়-

* বঙ্গীয় পুস্তকে এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু 'শ্রীধরজেন' এই পাঠই যেন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বোধ হয়। লিপিকর প্রমাদে 'জ' স্থলে 'স' হওয়া বিচিত্র নহে। জয়মঙ্গল "শ্রীধর সূনু" এই পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মঙ্গলকে প্রামাণিক বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বলেন,—"ভট্টিকাব্য ভর্ত্তৃহরি রচিত—ইহা অসম্ভব, কেন না ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা হইয়া বলভীরাজের আশ্রয়ে ছিলেন তাহা হইতে পারে না।" যদিও উক্ত প্রমাণ বড় অকাট্য নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মত বিরোধ নাই; বরং উহা অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণাবলীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা ভর্ত্তৃহরি ভট্টিকাব্যের রচয়িতা নহেন। ভরত মল্লিকও এমন কথা বলেন নাই যে, কোষকাব্যপ্রণেতা রাজা ভর্ত্তৃহরি ভট্টিগ্রন্থ লিখিয়াছেন; এই আপাত-বিরোধ মীংমাসার জন্যই দুইজন ভর্ত্তৃহরি কল্পিত করা গিয়াছে। অপর, জয়মঙ্গল প্রাচীন টীকাকার বলিয়াই যে প্রামাণিক হইবেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে, তাহা হইলে কালিদাসের 'দুর্ব্বাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা' ভারতীকে সঞ্জীবনী দ্বারা উজ্জীবিত করিবার প্রয়াস অর্ব্বাচীন মল্লিনাথকে করিতে হইত না। যাহা হউক, জয়মঙ্গল প্রামাণিক সন্দেহ নাই; তথাপি যে ভরত মল্লিক অধুনাতন হইয়াও তাঁহার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি নিজ মত পোষক সবিশেষ প্রমাণ অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত দর্পণ-টীকাকার প্রায় দ্বিশতবর্ষপ্রাচীন তর্কবাগীশকেও ভরতেরই তুল্যমতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। জয়মঙ্গল যে তাৎকালিক কোন অমূলক কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে একটা মত স্থাপন করিয়া যান নাই, কে বলিতে পারে? অপিচ ইতিপূর্ব্বে কাব্যের পরিসমাপক যে দুই শ্লোক

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিদ্বদ্বর্গের পরিতুষ্টির জন্য এবং স্বীয় আশ্রয় দাতা যশস্বী হউন—এই উদ্দেশ্যেই, তিনি কাব্য-রচনা করেন। কাব্য লিখিয়া নিজে নাম করিব—এমন ভাব তাঁহার দেখা যায় না। এমন কি, অপর কবিগণের ন্যায় তিনি সর্গসমাপ্তিসময়েও আপনার নামোল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন; এরূপ বিনীত নিষ্কাম কবি নিজ নামে কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন—ইহা আপাতদৃষ্টিতেই যেন অসঙ্গত বোধ হয়।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনার উদাহরণস্থলে ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম হইতে উনবিংশ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ভট্টির দ্বিতীয় সর্গের প্রথমাংশ পাঠ করিলে, বোধ হয়, যদি কবি সাধ করিয়া ব্যাকরণের নিগড়বদ্ধ না হইতেন, তাঁহার স্থান মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষের, পূর্ব্বে না হউক, পার্শ্বেই হইত। শব্দ শাস্ত্রের উপর তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, অপর কোন কবির তদ্রূপ ছিল কি না সন্দেহ; অথচ সহৃদয়তা এবং কবিত্বও তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। কাব্য লিখিয়া নিজের কবিত্ব খ্যাপন করা অপেক্ষা যাহাতে তাঁহার শক্তি বিদ্যার্থীর উপকারার্থে নিয়োজিত হয়, ইহাই যেন কবির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

এই কাব্যে প্রণয়ন সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। কবি একজন অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন;

নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়নমানসে আসিত। একদা তিনি অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ও ছাত্রদিগের মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা হস্তী চলিয়া গেল, এবং তজ্জন্য এক বৎসর অধ্যাপনা বন্ধ রাখিতে হইল। বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের পাঠ বন্ধ থাকিলেও কাব্যাদি উপশাস্ত্র সম্বন্ধে তত আঁটা আঁটি নাই; এই নিমিত্ত, শিষ্যদিগের উপরোধে, তিনি ব্যাকরণ শিক্ষার সাহায্যকারী কাব্য গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন এবং সংবৎসর কাল মধ্যে উহা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছিলেন।* এই জনশ্রুতির তথ্যানুসন্ধান সুদূর পরাহত।

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অনধ্যায়-প্রকরণে বিধান আছে;—

"পশুমণ্ডূকমার্জ্জার শ্বসর্পনকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশম্॥"

"পশুর্গবাদিঃ"—(কুল্লূক ভট্ট)। গবাদিতে হস্তীও থাকিবার কথা, তাহা হইলে এক অহোরাত্র মাত্র অনধ্যায় হওয়া উচিত ছিল;—সংবৎসর অনধ্যায়ের কোন হেতু দেখা যায় না। তবে মূষিক, নকুল, ভেক, সর্পাদি ক্ষুদ্র জন্তুর অন্তরাগমনে যে ব্যবস্থা, একটা প্রকাণ্ড জন্তুর পক্ষেও কি সেই ব্যবস্থা? এইরূপ বিতর্ক

* এদেশে প্রচলিত প্রবাদ;—অধ্যয়নে অনাবিষ্ট রাজপুত্র, ভর্ত্তৃহরির নিকট অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন। রাজপুত্রের ষড়যন্ত্রেই পাঠকালে অধ্যাপক এবং রাজপুত্রের মধ্য দিয়া হস্তী চালিত হয়। তৎপরে ভর্ত্তৃহরি সেই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণের উপদেশ দেন। অং সং

কারী কোন তার্কিকদিগ্‌গজ গজপক্ষে অনুপাতক্রমে এক বৎসর অনধ্যায় বিধান করিয়া এই একটা অমূলক কিংবদন্তী রটাইয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে ?

অস্মদ্দেশীয় টোলের ছাত্রদিগের নিকট ভট্টিকাব্যের বিলক্ষণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আশৈশব ব্যাকরণের সূত্রগুলি শুষ্ক উদাহরণ সহ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে; তাই, এই সকল সূত্রের সুপ্রযুক্ত সরস উদাহরণ-মালা দেখিয়া তাহারা বড়ই প্রীতি সহকারে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্যাকরণবিমুখ ইদানীন্তন কাব্যমধুকরগণের পক্ষে ভট্টিকাব্য নিতান্ত নীরস ও কর্কশ বোধ হইবারই কথা। বস্তুতঃ প্রথম কয়েক সর্গ ভিন্ন ভট্টির অপর সর্গগুলি যেন ব্যাকরণের এক এক পরিচ্ছেদ। কাব্য-বিভাগে ভট্টি যেমন দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, ব্যাকরণ বিভাগে উহা আবার, প্রধানতঃ, চারি কাণ্ডে বিভক্ত;— প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ—প্রকীর্ণ কাণ্ড, ষষ্ঠ হইতে নবম— অধিকার কাণ্ড, দশম হইতে ত্রয়োদশ—প্রসন্ন কাণ্ড এবং চতুর্দ্দশ হইতে দ্বাবিংশ—তিঙন্ত কাণ্ড। প্রকীর্ণ কাণ্ড নানাবিষয়ক, সুতরাং ইহাতে কবির কবিত্বের স্ফূর্ত্তিলাভের একটু অবকাশ ছিল; তাই প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ * সাহিত্যসেবীর কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিতে পারে এবং এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কয় সর্গের অধিকতর আদর। অধিকার কাণ্ডে কৃত্তদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসন্ন কাণ্ডে কবি-

* "পঞ্চম সর্গ 'প্রকীর্ণ' ও 'অধিকার' এই উভয় কাণ্ড মিশ্রিত।

বাক্যের প্রসাদ সূচক অলঙ্কার প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন, এবং তিঙন্ত কাণ্ডে আখ্যাত প্রকরণ অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থূল বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক কাণ্ডের আরও নানা উপ-বিভাগ আছে,—এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্যাকরণই কবির একমাত্র লক্ষ্য হওয়াতে কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে তিনি মৌলিকতা প্রদর্শনের অবসর পান নাই; কিন্তু আধুনিক কবিগণের প্রধান উপজীব্য বাল্মীকির অমর গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করাতে কাব্যের উপাদানের নিমিত্ত তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হয় নাই।

এখন এই প্রবন্ধ-সূচনায় উদ্ধৃত মম্মট ভট্টের কারিকাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক, এই মহা কাব্য লিখিয়া গ্রন্থকারের কি প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে এবং উহা পাঠে অধ্যয়নকারীরই বা কি ফললাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার 'কবি-যশঃ-প্রার্থী' ছিলেন না—বরং তৎ কাব্যজনিত কীর্ত্তি কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ আশ্রয়দাতা নরেন্দ্র নৃপতিকেই উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কবি স্বয়ং কি প্রার্থী না হইলেও, উল্লিখিত নিষ্কাম সহৃদয়তা প্রদর্শন করাতে তদীয় ন্যায্যপ্রাপ্য কবিযশঃ সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্যাকরণাধ্যায়ীদিগের দুষ্প্রাপ্য উদাহরণ রাশি রসাত্মক বাক্যাকারে গ্রথিত করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করাতে, কবি-কীর্ত্তির সঙ্গে তদীয় পাণ্ডিত্যকীর্ত্তি সম্মিলিত হইয়া গ্রন্থকারকে অনন্য-সাধারণ যশোভাজন করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং ভট্টিকাব্য তদী

প্রণেতার 'যশসে'ই হইয়াছে বলিতে হইবে। * অধ্যয়নকারীরও বিশেষ ফল আছে। মম্মটমতানুযায়ী 'ব্যবহার' পরিজ্ঞান ইহাতে কিঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকি অনেক পূর্ব্বেই অধিকতর দক্ষতা সহকারে তাহা সর্ব্বজন গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের অংশ বিশেষ (যথা দ্বিতীয় সর্গ) পাঠ করিলে 'সদ্যঃপর-নির্ব্বৃতি'ও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধানতঃ এই মহাকাব্য পাঠকের 'উপদেশযুজে'ই প্রণীত হইয়াছে। রাম-চরিত্রের পুণ্য কাহিনী যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহা কাব্যাংশে যেরূপই হউক না কেন, অধ্যয়নকারীর অন্তঃকরণে নায়কের মহৎ চরিত্রের ছায়া অল্পাধিক পাতিত করিবেই করিবে। এই নৈতিক উপদেশ ব্যতীতও ভট্টিকাব্যানুশীলনকারীর অন্যবিধ উপদেশ লাভ হয়, যাহা অপর কাব্যগ্রন্থ হইতে লাভ করা দুষ্কর। ধৈর্য্য-সহকারে এই গ্রন্থ সমগ্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে শব্দশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এই উপদেশ প্রার্থী, তাঁহার গ্রন্থোপসংহার কালীন গ্রন্থকারের একটি কথা মনে রাখা উচিত।

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে॥"

* কাব্যের কীর্ত্তি উপহার লাভ করিয়া, রাজা নরেন্দ্র কবির কিঞ্চিৎ পুরস্কার বিধান করিয়াছিলেন কি না এবং রামলীলাত্মক কাব্য-প্রণয়নে কবির কোন (আধ্যাত্মিক বা শারীরিক) অশিবোপশম হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই। সুতরাং ভট্টিকাব্য গ্রন্থকারের 'অর্থকৃতে' এবং 'শিবেতরক্ষতয়ে' হইয়াছিল কি না বলা অসম্ভব।

ফলতঃ অগ্রে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন না হইয়া এ
কাব্য অধ্যয়ন করিলে যথেপ্সিত ফল লাভ করা এক প্রক
অসম্ভব।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ",—সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গি
হইলেও, আরও একটি কথা বলিতে হইল। টোলে
ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের মুখে একটি শ্লোকার্দ্ধ শুনা যায়—

"ভট্টাবেকস্ত্রয়ো মাঘে রঘৌ কাব্যং পদে পদে।"

এই "একে"র ব্যাখ্যা কেহ করেন 'সর্গ', কেহ করে
'শ্লোক'। সর্গবাদীরা দ্বিতীয় সর্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে
তৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। শ্লো
রাদিগণের মধ্যে কেহ উক্ত সর্গের ষষ্ঠ, কেহ বা ঊনবি
শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, এই উভয় শ্লোকই অ
মধুর এবং তজ্জন্য তাহা পাঠক সাধারণের সুবিদিত হইলেও, এ
প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।-

"প্রভাত বাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্॥"

* * *

"ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্ পদম্।

নষট্ পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥”

আশা করি, এতদ্দ্বারা ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের স্বভাব সিদ্ধ কবিত্ব শক্তি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারা যাইবে।

জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩০২।

কালিদাসের কাহিনী।

(১) বিবাহ।

মহাকবি কালিদাস ভারতের অমূল্যরত্ন। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যাঁহার গৌরবে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে সমস্তই অন্ধকারের গভীর গহ্বরে নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ, জীবনাখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা এতদ্দেশে বর্ত্তমান না থাকাতে, প্রাচীন ভারতের বড় বড় লোকের জীবনের ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে। এই জীবনাখ্যায়িকার অভাব নিবন্ধন, এই সকল বড় লোকের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, তাহা কতকগুলি লোক-পরম্পরাগত কাহিনীর উপরই অগত্যা নির্ভর করিতেছে। কালিদাসসম্পর্কে যাহা কিছু সাধারণের গোচরীভূত, তাহাও এই অজ্ঞাতমূলা কিংবদন্তীর উপরেই সংস্থাপিত। এই সকলের আলোচনায় বিশেষ কোন লাভ না থাকিলেও আমোদ যথেষ্টই আছে।

জগতে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত এই যে কালিদাস, তিনি নাকি বাল্যে একজন গণ্ড-মূর্খ ছিলেন! কেবল স্বয়ং মূর্খ নহেন, মূর্খের পুত্র মূর্খ। পিতামহও মূর্খ ছিলেন কি না, এতদ্বিষয়ে কিংবদন্তী নীরব। কালিদাস কোন্ সময়ের লোক—

তাহা লইয়া গবেষণাপটু মনীষিগণের মধ্যে এযাবৎ বিচার-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আরও একটি ক্ষুদ্র সমস্যা যোগ করা যাইতেছে। যে সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আপনাপন সন্তানদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন রূপ নিগড়পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই কালিদাস জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের দ্বৈ-পুরুষিকী মূর্খতার প্রমাণও জন-শ্রুতি,—আজকাল এই 'শ্রুতির' প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য হইবে বলিতে পারি না।

কালিদাস বাগ্দেবীর অসাধারণ কৃপাপাত্র—নানা দিগ্দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্রবর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। অধ্যাপকের অসামান্য পাণ্ডিত্য দর্শনে শিষ্যগণ ভাবিল, না জানি তাঁহার পিতৃদেব কতই অগাধ বিদ্বান্,—কারণ, তখনকার লোকের ধারণা ছিল, জগতে পাণ্ডিত্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রস্ব হইতেছে। কালিদাসের সময়ে শিষ্যেরা "গুরু কুলে" বাস করিত কি না, গবেষণাসাপেক্ষ; কিন্তু কালিদাসের শিষ্যগণ গুরুর পিতৃদেবের সাক্ষাৎকার লাভ সহজে করিতে পারে নাই, একথা নিশ্চিত। যাহা হউক, শিষ্যগণের বহু অনুরোধে কালিদাস স্বীয় জনকের সহিত উহাদের পরিচয় করাইতে সম্মত হইলেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বার্দ্ধক্যোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া জপ-মালা হস্তে উচ্চৈঃ-স্বরে তারকব্রহ্ম 'রাম' নাম মাত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে পুত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, কালিদাস-জনক কুতূহলী ছাত্রবর্গের সম্মুখে আগমন করিলেন। কালিদাসের পিতা যে কেবল মূর্খ ছিলেন

এমন নহে; জীবনের পূর্ব্বতন কালে যে কোন দিন তিনি ভগবন্নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, বক্ষ্যমাণ ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ 'রাম', 'রাম' উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া মূর্খত্বসূচক জিহ্বার জড়ত্ব নিবন্ধন "রাভণ" "রাভণ" বলিতে লাগিলেন। অধ্যাপক-জনকের এই দিগ্‌গজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া শিষ্যগণ ঈষদ্ধাস্যে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কালিদাস অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা বুঝিতে পারিলে না, পিতৃদেব তোমাদিগের নিকট এই পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন,—

"কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
রক্ষঃশ্রেষ্ঠে কুলজ্যেষ্ঠে স কথং নাস্তি রাবণে ?"

কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এই দুয়েতেই ভকার বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হইয়াও এমন কি অপরাধ করিলেন যে, তাহাতে মহাপ্রাণ ভকার নাই ?" কালিদাসের ছাত্রগণ এই পুর্ব্বপক্ষের কোনও মীমাংসা করিতে পারিয়াছিল কি না, আমরা তাহা অবগত নহি।

এমন মূর্খের পুত্র মূর্খ হইবে না ত কি ? এই পৈতৃক প্রকৃতি লইয়া "মন্থনের পূর্ব্বে অনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তি অর্ণবের ন্যায়" যখন কালিদাস, ব্রাহ্মণ হইয়াও গোচারণের মাঠে বিরাজমান হইয়া গো-নিতম্বোপরি লবণ রক্ষা পুর্ব্বক মূর্খত্বের স্মারক স্বরূপ, সক্ষার বদরীর স্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন যে জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল না, এমন নহে; বরং উহা কেবল পুরুষের

করায়ত্ত না থাকিয়া কোন কোন রমণী রত্নেরও আয়ত্ত হইয়াছিল। ভারতের কোন্ এক রাজার পরম রূপসী কন্যা সার্থকনাম্নী বিদ্যোত্তমা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, "যিনি আমাকে বিচারে পরাজয় করিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।" সৃষ্টির আদ্যা নায়িকা মহাবিদ্যা যে প্রতিজ্ঞাবাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, * এতৎ কাহিনীর নায়িকা বিদ্যোত্তমা তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন। বররুচির নায়িকা 'বিদ্যা' (ভারতচন্দ্রের কৃপায় বঙ্গদেশে যিনি সুপরিচিতা) যে এই বিদ্যোত্তমারই এক অনুকৃতি নহেন, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ বররুচি কালিদাসেরই সহযোগী (এবং প্রতিযোগী) ছিলেন, এ কথাও স্মর্ত্তব্য। অথবা, শক্তিরূপিণী নারী-জাতির মধ্যে কোন একটা শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ হইলেই বুঝি, তত্তৎ শক্তি দ্বারা পুরুষবিজিগীষাই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কোন 'বিদুষীর' জীবনী ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে। যাহা হউক, বিদ্যোত্তমার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া অনেক মহামহোপাধ্যায় আসিয়া জুটিতে লাগিলেন, কিন্তু একে একে সকলেই পরাস্ত হইয়া গেলেন। হায়, বিদ্যোত্তমার ভাগ্যে বুঝি আর "সুন্দর" বা "মেধাবী" পতি-লাভ ঘটিবে না!

---

* শুম্ভপ্রেরিত দূতের প্রতি ভগবতীবাক্য—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

নির্জ্জিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কতকগুলি যুবক একত্র ষড়্‌যন্ত্র করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই বিদ্যোন্মত্তা বিদ্যোত্তমার সঙ্গে একটা হস্তি-মূর্খের বিবাহ দিতে হইবে এবং এতদাশয়ে তাঁহারা তদ্রূপ মূর্খের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহাদের মনোরথ সফল হইতে বিলম্ব হইল না, অচিরেই দেখিলেন, এক যুবক এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া ঐ শাখারই মূলভাগ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সে এমনই মূর্খ যে, ছেদনকার্য্য সমাপ্ত হইলেই যে শাখাসহ স্বয়ং ভূমিসাৎ হইবে, ইহাও তাহার মনে উদিত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খ মিলিবে না ভাবিয়া পণ্ডিতের দল উহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইলেন। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের গল্পের নায়ক—সরস্বতীর ভাবী বরপুত্র। বৃক্ষাবতীর্ণ কালিদাসকে পণ্ডিতের দল বুঝাইলেন যে, তাহাকে এক রূপবতী রাজকন্যা বিবাহ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল তাঁহাদের অনুগামী হইতে হইবে এবং বিবাহক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনাভাবাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। বিবাহের নামে কাষ্ঠপুত্তলিকাও নাকি মুখব্যাদান করিয়া থাকে। তাই মূর্খ কালিদাস উহাতে অবশ্যই সম্মতি দিলেন।

পণ্ডিতেরা কালিদাসকে তাঁহাদের অধ্যাপক বলিয়া রাজকন্যার নিকট পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, ইনি সম্প্রতি 'বাচংযম'—কাহারই সহিত্ব আলাপমাত্রও করেন না, ইঙ্গিতে মাত্র স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। একটি যুবক এতগুলি পণ্ডিতের অধ্যাপক, ইহাতে বিদ্যোত্তমা বিস্মিতভাবে কালিদাসের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলে, মূর্খ কালিদাস কি জানি কি ভাবিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি বক্র করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে পণ্ডিতের দলে মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল, তাঁহারা ব্যাখ্যা করিলেন, আমাদের অধ্যাপক দুই হস্তের (বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত) অষ্টাঙ্গুলি বক্র করিয়া বুঝাইলেন যে, অষ্টাবক্র ঋষি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে জনক রাজার সভা জয় করিয়াছিলেন, সুতরাং "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"। এইরূপে কালিদাস যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করিলেন, পণ্ডিতদিগের কেহ না কেহ তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। অতঃপর অধ্যাপকের হইয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যোত্তমার সঙ্গে বিচার আরম্ভ করিলে, যে যে স্থানে রাজকন্যা পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া আনেন, সেই সেই স্থলেই অমনি এক জন পণ্ডিত গিয়া কালিদাসের পশ্চাদ্ভাগে চিম্‌টি কাটিতেন, তাহার যন্ত্রণায় মৌনী কালিদাস হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন। * রাজকন্যা এই সকল দেখিয়া কালিদাসকে মহাপণ্ডিত স্থির করিলেন এবং শিষ্যগণকে ছাড়িয়া অধ্যাপকের সঙ্গে সাংকেতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যোত্তমা কালিদাসের প্রতি এক অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেন; মূর্খ কালিদাস কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুই অঙ্গুলি দেখাইলেন। এবার অতি-

* গল্প আছে, কোনও বিদ্যালয়পরিদর্শক একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বস্তু স্ব শব্দের উত্তর ঙস্ (ষষ্ঠীর একবচনে) করিলে কি হয়?" অধ্যাপক দেখিলেন ছাত্র ঠকিয়া আসিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ছাত্রের পশ্চাতে গিয়া জোরে একটি চিমটি কাটিলেন, অমনি ছাত্র "উঃ" করিয়া উঠিল, প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া গেল। এই অধ্যাপকও বুঝি কালিদাসের শিষ্যীভূত পণ্ডিতগণের কাহারও শিষ্যপরম্পরাভুক্ত ছিলেন।

বুদ্ধিমতী রাজকন্যা আপনিই পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সেই মূর্খের গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া পণ্ডিতের দলের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। সভাস্থ সকলে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি প্রশ্ন করিলেন, কি উত্তরই বা মিলিল, যে ইহাকে বরণ করিলেন?" বিদ্যোত্তমা উত্তর করিলেন, 'আমি ইঁহাকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম বিষয়ক পুর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলাম, ইনি ইঙ্গিতে প্রথমতঃ স্বীকার করিলেন—ব্রহ্মপদার্থ এক, কিন্তু তথাপি প্রকৃতি পুরুষ এই দুইয়ে বিভক্ত না হইলে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল হয়েন না, পশ্চাৎ ইহাই বুঝাইলেন।'

যথারীতি বিদ্যোত্তমা ও কালিদাসের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কোন স্মার্ত্ত পাঠক অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "রাজকন্যা অবশ্যই ক্ষত্রিয়ের দুহিতা ছিলেন, (কেননা তখনও আজিকালিকার ন্যায় ঔপাধিক চাতুর্ব্বর্ণিক রাজা সৃষ্ট হয়েন নাই, ইহা নিশ্চয়।) তবে ব্রাহ্মণ কালিদাসের সঙ্গে কিরূপে তাঁহার বিবাহ হইল?" এতদুত্তরে মহাকবি ভারতচন্দ্রের "পণে জাতি কেবা চায়?" এই কথার দোহাই দিয়া কন্যাপক্ষকে সান্ত্বনা করিতে পারা যায়; কিন্তু বরপক্ষকে সহজে বুঝান দায়। তবে, অপর বিষয়ে কথঞ্চিৎ মানবিক উদারতা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াবিবাহ প্রথা) বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইয়া কিংবদন্তীর পক্ষ অনুসরণ করিতে হইবে।

বিবাহান্তে দম্পতী বাসরগৃহে নীত হইলেন। তথায় পালঙ্কোপরিমশারি ঝুলান ছিল। মূর্খ কালিদাসের মনে হইল, 'কন্যা

পালঙ্কোপরি বসিয়াছে, আমাকে বুঝি তদুপরি বিস্তৃত মশারির উপর বসিতে হইবে।' এই ভাবিয়া মশারির উপর আরোহণ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র উহা ছিঁড়িয়া গেল, এবং কালিদাস রাজকন্যার উপরে পড়িয়া গেলেন। এত বড় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের এইরূপ ব্যবহারে বুদ্ধিমতী বিদ্যোত্তমার বিস্মিত হইবার কথা বটে ; কিন্তু একটা ঘটনার উপর সকল সময় মতামত নির্ভর করে না, কেননা তাহা আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে। তথাপি রাজকন্যার অন্তরে সন্দেহ জন্মিল। তখন সহসা একটা উষ্ট্র ডাকিয়া উঠাতে রাজকন্যা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ডাকিতেছে ?" এইবার বরপাত্রের প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল,— তিনি একবার বলিলেন, 'উষ্ট', পরক্ষণে আবার বলিলেন, 'উট্র'। এতক্ষণে বিদ্যোত্তমার চৈতন্য হইল ; তিনি বিজিত পণ্ডিতগণের এই গূঢ় পরিহাসরূপ ষড়্‌যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হইল। তখন, তাদৃশ অবস্থাগত ব্যক্তির ন্যায়, দোষ দিবার অপর পাত্র না পাইয়া, দগ্ধকপাল বিধাতাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিলেন,—

> "কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
> কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ।
> উষ্ট্রে লুম্পতি রংবা ষংবা
> তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা ॥"

বিদ্যোত্তমে ! আক্ষেপ করিলে কি হইবে ? সংসারের গতিই ঈদৃশী,—তোমার সম দুঃখভাগিনী জগতে তোমার অনেক ভগিনীই

ছিলেন, আছেন ও হইবেন। কিন্তু এ—ছি ছি!—কি করিলে, মূর্খ বলিয়াই কি স্বামীকে (ব্রাহ্মণকে) পদাঘাত করিতে হয়, এই কি তোমার বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম? ঐ দেখ গণ্ড-মূর্খ হইলেও তোমার এই জড়বুদ্ধি স্বামী লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে, ম্রিয়মাণ হইয়া এই গভীর রজনীর অন্ধকারে কোথায় লুকাইতে চলিয়াছে। তুমি আজ অভিমানে অহঙ্কারে উহা দেখিলে না; কিন্তু একদিন তোমাকে এই নিমিত্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে—ইহা কি তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও বুঝিলে না?

পাঠক! মূর্খের কীদৃশী মর্য্যাদা, বুঝিলেনত? কাহারও গৃহে যেন মূর্খত্বের প্রশ্রয় দেখিতে না হয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

সাহিত্যসেবক, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

কালিদাসের কাহিনী।

(২) বিদ্যালাভ।

কিন্তু গল্প লিখিতে বসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, পূর্ব্বে ইহা জানিলে, এ কাজে হাত দিতাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল গল্পের মূল জন-শ্রুতি; বাজারে আজকাল আসল "শ্রুতি"রই ততটা বিশ্বসনীয়তা নাই, এ'ত 'জন-'শ্রুতি। তুমি বলিলে, "তোমার এই কাহিনীর মুখপাতই ঘোরতর অবিশ্বাস্য; কেন'না, এত বড় পণ্ডিত কালিদাস,—তিনি যুবা বয়সেও নিরেট মূর্খ ছিলেন, এটা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা; দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যোত্তমা হেন প্রতিভা-শালিনী রাজকন্যাও কিনা বাসর ঘরে না যাওয়া পর্য্যন্ত একটা গণ্ডমূর্খের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইতে পারিলেন না! ইতিমধ্যে একটা বিবাহক্রিয়াও ত নিষ্পন্ন হইয়া গেল? মনূক্ত দশবিধ বিবাহ, কিংবা সুধীবর কালীপ্রসন্ন ঘোষের "প্রমোদলহরী"তে উল্লেখিত অশেষবিধ বিবাহ, ইস্তক ৭২ সালের কৈশবী-সংহিতা-বিহিত বিবাহ, এতৎ সমুদয়ের পদ্ধতিরাশি খুঁজিয়া দেখিলাম, কৈ কোন পদ্ধতিতেই ত একেবারে একটা বিকট মূর্খ প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত বলিয়া পার পাইতে পারে, এরূপ কোনও ফাঁক দেখা গেল না; জানি না, বিদ্যোত্তমার সঙ্গে কালিদাসের কিরূপে নিরা-পদে বিবাহব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গেল!" আমি তোমার এই পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তি ত পূর্ব্বেই এক প্রকার মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু

তথাপি তুমি যে দুইটি কারণ প্রদর্শন করিতেছ, তাহার বিরুদ্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। (১) জীবনের মধ্যবয়স পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিয়াও জগতে অনেকে পরিণামে প্রগাঢ় বিদ্যাবান্ হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে কোনও দৃষ্টান্ত তুমি প্রামাণ্য বলিয়া না মানিতে পার, কিন্তু সচরাচর কালিদাসকে যাহার সঙ্গে উপমিত করা হয়, সেই পাশ্চাত্য কাব্যকুঞ্জের কোকিল শেক্সপীয়রকেই ধর না কেন? যিনি যৌবনের প্রারম্ভে উদ্দাম অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেন, সেই ব্যক্তি জীবনের গভীর সমস্যারাজি নাটকমুখে ব্যক্ত করিবেন, কে অনুমান করিয়াছিল? ভারতে ইংরাজ রাজ্যের প্রবর্ত্তক সুচতুর লর্ড ক্লাইবের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া তদীয় বৃদ্ধ জনক নাকি বলিয়াছিলেন "after all, Booby has sense!"—(যা' হউক, বুবিরও দেখিতেছি বুদ্ধি আছে!)। আরও দৃষ্টান্ত চাও ত ৺ বিদ্যাসাগরের "চরিতাবলী" খুঁজিয়া দেখ। (২) যাঁহারা বিচারসভায় একটা দিগ্‌গজ মূর্খকে মহামহোপাধ্যায় * করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতের দল বিবাহসভাতেও অবশ্যই হাজির ছিলেন; তখন দশচক্রে যেমন ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভূতকল্প কালিদাসকে উঁহারা দশজনে মিলিয়া 'ভগবান্' করিয়া তুলিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ কালিদাস মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার

* বঙ্কিমের কৃপায় জানি, 'দিগ্‌গজ' অর্থে গণ্ড মূর্খ। কিন্তু তদ্বিপরীত "মহামহোপাধ্যায়" শব্দের যে কি অর্থ, উপাধির তালিকা দেখিলে, তদ্বিষয়ে কিছু গোলযোগ ঘটে বটে।

রূপের অভাব ছিল না ; বরং তিনি যে সুশ্রীক যুবা পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সবিশেষ প্রমাণ আছে—তাহা পশ্চাৎ বলিব। একে ত "কন্যা কাময়তে রূপং", তায় বিদ্যোত্তমা বিদুষী হইলেও যুবতী —এ অবস্থায় মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়, সূক্ষ্মদর্শন চলিয়া যায়, 'বলবদিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' !—পাশ্চাত্য জগতেও অনুরাগকে 'অন্ধ' বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সুতরাং রাজকন্যা প্রতিভাশালিনী হইলেও এ ক্ষেত্রে প্রতারিত হইবেন, ইহা বড় বিস্ময়কর নহে। যাহাই হউক, প্রাচ্য রীত্যনুসারে "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" এই বচনের দোহাই দিয়া মদীয় বক্তব্যের মধুরেণ সমাপন করিলাম। এই উত্তর তোমার হৃদয়গ্রাহী না হয় ত আমি আর কি বলিব ? এস্থলে স্পষ্টই বলা ভাল,—আমি আর এইরূপ কৈফিয়তের অধীন হইতে চাই না—দিবার চেষ্টাও করিব না—তোমার জন্য আমি গল্পের রসভঙ্গ করিতে পারিব না।

আজ অনেক দিন হইল কালিদাস নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবিসময়প্রসিদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তন্মধ্যে "পাদাঘাতাদশোকঃ বিকসতি * * যোষিতাং",—অর্থাৎ সুন্দরীগণের পদপল্লবাঘাতে অশোকতরুর মুকুলোদ্গম হইয়া থাকে। কবি কালিদাস বহুবার এই প্রসিদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারই জীবনের অবস্থা বিশেষের আভাস পাওয়া যায় ;—তিনি নিজেই অশোক তরু জাতীয় কিছু ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কেননা, স্বীয় বনিতার

পাদাভিহত হইবার পরই যেন তদীয় জ্ঞানমুকুল উদ্গত হইল; তিনি অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিদ্যাদেবীর উদ্দেশ করি লাগিলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দর্শনে কোন সি মহাপুরুষ তাঁহাকে সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। একাগ্রচি বহুদিন সরস্বতী সাধনার পর তাঁহার প্রতি অভীষ্ট দেবত দয়া হইল—এমনই হইল, যে আজিও বাগ্দেবীর আরাধ সময়ে ভক্ত বলেন—দেবি, অধমের প্রতি ঐরূপ কৃপা প্রদ কর, "যা কালিদাসে করুণা তবৈব।"

কালিদাস যে স্থলে সাধনা করিতেছিলেন তাহার সন্নিকটে একটি কুণ্ড ছিল, তাহার নাম "সরস্বতী কুণ্ড"। সাধনার স ফলপ্রদান মানসে দেবী আদেশ করিলেন, "বৎস, সরস্বতী কু অবগাহন কর, তোমার অভীষ্ট ফললাভ হইবেক। কালিদাস কু একবার ডুব দিয়া উঠিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, " দেখিলে?" কালিদাস প্রাকৃত ভাষায় বলিলেন "পাঁক" দ্বিতীয়বার ডুব দিতে আদিষ্ট হইয়া, তৎকরণান্তর তৎপ্রতি প্র হইল "এবার কি দেখিলে?" কালিদাস তখন সংস্কৃতে বলিলে "পঙ্ক"। তৃতীয়বার ঐ প্রকারে ডুব দিয়া দুই হস্তে দুইটি ক লইয়া ভাসিলেন, এবং পুনশ্চ ঐপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিলে "পঙ্কজ"। তখন কালিদাসের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—তিনি ত সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া কবিতা রচনা করিলেন :—

পদ্মমিদং মম দক্ষিণহস্তে
বামকরে লসদুৎপলমেকং।

ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে
কর্কশনালমকর্কশনালম্ ॥

হে কমললোচনে ! আমার দক্ষিণ হস্তে এই একটি পদ্ম, আর বাম করে একটি সুন্দর উৎপল রহিয়াছে; বল, কোন্‌টি তোমাকে দিব,—কর্কশনাল পদ্ম না মসৃণনাল উৎপল?

আরাধ্যাদেবতা ভারতী বরপুত্রের মুখে এইরূপ সামান্য নায়িকার ন্যায় সম্বোধন শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, বৎস ! দেবতার পাদ-মূলে দৃষ্টি না করিয়া একেবারে মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করা সুরুচিবিরুদ্ধ ; যদিও তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে, তথাপি তোমার বুদ্ধিদোষে তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া গণিকা গৃহে প্রাণ হারাইবে।" কালিদাসের অন্তিমকাহিনী আপাততঃ আলোচ্য নহে, নতুবা দেবীর অভিশাপের সফলতা প্রদর্শন করা যাইত। কিন্তু কালিদাস তদবধি সাবধান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তাই কুমারসম্ভবে উমার রূপবর্ণনা কালে পাদপদ্ম হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। হায় ! কবির এই জ্ঞানটুকু যদি সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন মাত্রেই জন্মিত তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কলঙ্ককাহিনীও শুনিতে পাইতাম না, তাঁহার অকালে শোচনীয় মৃত্যুও ঘটিত না।—যাউক্, সে সকল কথা পশ্চাৎ বলিব।

দেবী-বরে জ্ঞানলাভ হইলে কালিদাস গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কালিদাস 'জ্ঞানী' হইলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না ; তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই উহার প্রমাণ। তাই অবমাননাকারিণী স্বীয় বনিতার গৃহাভিমুখেই তিনি ধাবিত

হইলেন, কারণ বিদুষী কলারসজ্ঞা রাজকন্যার সহবাসে অর্থকাম-লালসার সম্যক্ পরিতৃপ্তি সাধনের আশাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। রাজবাটীতে পৌঁছিয়া কালিদাস বরাবর বিদ্যোত্তমার কক্ষের কবাটে গিয়া আঘাত করিলেন ; কে, কি জন্য আগমন, এইরূপ কিছু প্রশ্ন হইলে, কালিদাস বলিলেন, "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ।" * বিদুষীবিদ্যোত্তমা এই সংস্কৃতোত্তর শুনিয়া দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক, পরিণেতার আকস্মিক পুনরাগমন এবং অবস্থান্তর প্রাপ্তি দেখিয়া, অবশ্যই যুগপৎ সন্ত্রস্ত, হৃষ্ট ও লজ্জিত হইলেন; এবং বোধ করি, উভয়ের মধ্যে প্রণয়সন্ধি স্থাপন করিতেও বেশীক্ষণ লাগিল না। প্রিয়তমের প্রথম সম্ভাষণ প্রণয়িনীর হৃদয়ে অবশ্যই অপূর্ব্ব স্মৃতি-মূলক হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাই বিদ্যোত্তমা "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ'! এই কথা কয়টি যাহাতে জগতে চিরদিন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অটুট বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ থাকে, তাহারই বিধান করিলেন। ভার্য্যা বিদ্যোত্তমার অনুরোধেই কবি "অস্তি" † শব্দে "কুমার-সম্ভবের", "কশ্চিৎ" ‡ শব্দে "মেঘদূতের", এবং "বাগ্বিশেষঃ" পদের প্রয়োজনীয়াংশ "বাক্" §

* উত্তরটা কিছু 'খাপ্-ছাড়া' বোধ হইতে পারে ;—এই কি ভারতীর বর-পুত্রে প্রাথমিক প্রিয়া-সম্ভাষণ ?· কিন্তু কিংবদন্তী-মূলক গল্পের অনুসরণ করিতে হইলে, ইহা কে এতদপেক্ষা বেখাপ্-তর কথাও বলিতে হইবে।

† অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, ইত্যাদি।

‡ কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, ইত্যাদি।

§ বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে, ইত্যাদি।

শব্দে "রঘুবংশের" ভিত্তিসংগঠন পূর্ব্বক তিন খানি অমূল্য কাব্য গ্রন্থন দ্বারা জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

কালিদাস এতদ্ভিন্ন প্রিয়তমাকেই সম্বোধন করিয়া দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,—একখানি "ঋতুসংহার" নামক ষড় ঋতু বর্ণনামূলক খণ্ডকাব্য, অপরখানি সাধারণতঃ প্রচলিত কতক-গুলি ছন্দের লক্ষণাত্মক "শ্রুতবোধ" নামক পুস্তিকা। ইহাতে কালিদাসের প্রণয়িনী যে একজন কাব্যরসজ্ঞা ও লাবণ্যবতী রমণী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "বিক্রমোর্ব্বশীতে" কাননমধ্যে উর্ব্বশীকে হারাইয়া পুরুরবার, "রঘুবংশে" ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের এবং "মেঘদূতে" প্রণয়িনীর নিমিত্ত যক্ষের যে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ বর্ণিত আছে, কে জানে ঐ সকল ক্বচিৎ-প্রোষিত, অথবা মৃত-ভার্য্য কবির আত্মানুভূতির ফল কি না?

[সাহিত্য-সেবক শ্রাবণ ১৩০৩।]

কালিদাসের কাহিনী।

---

(৩) কর্ণাট-বিজয় যাত্রা।

প্রাচীন ইতিহাসে যেমন ভূপতিবৃন্দের দিগ্বিজয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ পণ্ডিত বর্গেরও নানা দিগেদশীয় রাজ-সভা-বিজয়ের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্রের দিগ্বিজয় বহু দিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রের দিগ্বিজয় অদ্যাপি ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে খ্যাতনামা নরপতিগণ অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের সভায় নানাশাস্ত্রবিশারদ বহু মহামহোপাধ্যায় সমাগত হইয়া অশেষবিধ শাস্ত্রালাপ দ্বারা রাজগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেন। বিশেষতঃ, তখন ভূপতিগণ মন্বাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে রাজ্যের যাবদীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করায়, তাঁহারা সন্দিগ্ধ-স্থলের মীমাংসার নিমিত্ত নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। পরন্তু, এতাবৎ পণ্ডিতসভা পরিপোষণের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলেও, প্রত্যুৎপন্নমতি কবি এবং কাব্যালঙ্কারনিপুণ পণ্ডিতগণদ্বারাই রাজসভার প্রকৃত শোভা সম্পাদিত হইত এবং তাঁহাদিগের রসময়ী ভারতী রাজগণের কঠোর রাজকার্য্যের মধ্যে সাতিশয় চিত্তবিনোদ সাধন করিত। এতদ্ভিন্ন আপন সভাসদ

কবি বা পণ্ডিত অপর রাজার আশ্রিত সভাসদগণকে স্ব-প্রতিভায় পরাজয় করেন, ও তদ্দারা তদীয় পণ্ডিতবর্গ অপর রাজ্যাধিষ্ঠিত বিদ্বন্মণ্ডলী অপেক্ষা সমধিক যশস্বী হয়েন, সহজ-বিজিগীষু তাৎকালিক নৃপতিবর্গের ইহাও এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং এতদর্থে তাঁহারা স্বীয় সভাস্থ বিদ্বজ্জনমাত্রকেই সাতিশয় প্রোৎসাহিত করিতেন। ফলতঃ, তখন প্রতিভাশালী পণ্ডিতমাত্রই কোন না কোন নৃপতির সভায় বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত অবস্থান করিতেন এবং স্বীয় প্রতিভাদ্বারা অপর রাজার পণ্ডিত-সভাকে পরাস্ত করিয়া নিজের ও আশ্রয়দাতা নৃপতির যশোবর্দ্ধনে সতত যত্নশীল থাকিতেন।

এইরূপে কবি কালিদাসও রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আশ্রয়লাভ করেন। এই ভূপতির সভায় আরও আটজন পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন, সম্প্রতি কালিদাসকে লইয়া নয়জনে "নব-রত্ন" * হইলেন। বলা বাহুল্য, ভারতীর বরপুত্র অচিরেই শ্রেষ্ঠতম "রত্ন" হইয়া উঠিলেন এবং দিগ্বিজয়ার্থ নানাস্থলে প্রেরিত হইতে লাগিলেন।

তৎকালে কর্ণাট-রাজের সভাও অশেষ বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা পরিশোভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছিল।

* ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটখর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য ॥

বিজিগীষু কালিদাস, একদা, বররুচি নামক অন্যতম "রত্ন"কে ভৃত্য সাজাইয়া, কর্ণাট-রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে বহির্বাটিকায় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া রজনীযোগে এক বিদুষী রমণীকে কবির পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। গভীর নিশীথে একাকিনী রমণীকে অন্তঃপুর হইতে নির্ভয়ে আসিতে দেখিয়া কালিদাস চমৎকৃত হইলেন, এবং উহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"উন্নাদাম্বুদ বর্দ্ধিতান্ধতমসা প্রভ্রষ্ট দিঙ্মণ্ডলে
কালে জাগ্রদুদগ্র যামিক ভট প্রারব্ধ কোলাহলে।
কর্ণস্থা সুহৃদম্বুরাশি বড়বা বহ্নের্যদন্তঃপুরা-
দায়াতাসি তদম্বুজাক্ষি কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাম্॥"

গুরুনিনাদকারী মেঘসমূহ দ্বারা রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হওয়াতে দিঙ্ নির্ণয় হওয়া দুরূহ; সময় বুঝিয়া নিশা-প্রহরীরা জাগিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; ঈদৃশাবস্থায় শত্রু-নিসূদন কর্ণাটরাজের অন্তঃপুর হইতে, হে সুলোচনে, তুমি আসিতে পারিয়াছ, ইহাতে অনুমান হয়, স্ত্রীজাতি ভীরু—একথা অমূলক।

কবিতাটি বিদুষার বড় মনঃপূত হইল না। ‡ তিনি বলিলেন, "আমি কর্ণাট-রাজের প্রেয়সী,—একজন প্রসিদ্ধ কবি আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি কীদৃশ—জানিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এখানে কবির অসদ্ভাব দেখিতেছি—

‡ কর্ণাট-রাজের ও এইটি ভাল লাগে নাই। সে কথার আলোচনা পরে করা যাইবে।

"একোঽভূন্নলিনাদেকশ্চপুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরঃ
সর্ব্বে তে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যোনমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বঞ্চো যদি গদ্যপদ্যলিখনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া ॥"

একজন বিষ্ণুর-নাভিকমল, একজন নদীসৈকত, অপর বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অর্থাৎ, ব্রহ্মা, ব্যাস এবং বাল্মীকি;— তাঁহারা সকলেই কবি, তাঁহাদিগকে বন্দনা করি। আধুনিক অপর কেহ যদি গদ্যপদ্য রচনা দ্বারা চিত্ত চমৎকৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি, কর্ণাট-রাজপ্রেয়সী, তাঁহাদের বামচরণ মস্তকে ধারণ করি।"* কবি রমণীর এবম্প্রকার উক্তি শুনিয়া নীরব রহিলেন। ইহাতে কর্ণাট-রাজ-রঙ্গিনী কালিদাসকে নির্ব্বোধ স্থির করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা কবিকে তৎপরে তদীয় সভাসদ কবি বল্লনের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে, বোধ হয়, নিয়ম ছিল যে কোন নূতন কবি রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা অগ্রে তাঁহাকে গোপনে পরীক্ষা করিতেন এবং যদি তদ্দ্বারা আগন্তুকের গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে আপন সভাস্থ পণ্ডিত দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া পরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। এই জন্যই বোধ হয় কালিদাসকে বল্লন-ধামে পাঠান হইল।

* এখানে একটু শ্লিষ্টান্বয় আছে; শেষ পদের অর্থ "তাহাদের মস্তকে আমি বামপদ দেই" এরূপও হইতে পারে।

বল্লন লোকটী সরল প্রকৃতির ছিলেন না। এইজন্য, পরীক্ষার্থ যখন বল্লন কালিদাসকে প্রভাতবর্ণন সূচক একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন, তখন কালিদাস মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "যদি কবিতা উত্তম হয়, তবে রাজসাক্ষাৎকার দুর্লভ হইয়া উঠিতে পারে, অতএব ইহার সমক্ষে মূর্খত্বের ভাণ করাই শ্রেয়ঃ।" এই বিবেচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কালিদাস উত্তর করিলেন :—

"প্রাতরুত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয় স্মটঃ।
নগরে ভাবতে কুক্কুশ্চবৈতুহিচবৈতুহি ॥" +

'হে রাজন্! নগরে কুক্কুট-ধ্বনি হইতেছে,—প্রভাত হইয়াছে,—উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করুন।'

এই অদ্ভুত কবিতা শুনিয়া বল্লনকবি ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "বাঃ, দিব্য কবিতা!' অনুগ্রহ করিয়া যদি লিখিয়া দেন, আমার বালকদিগকে শিখাইতে পারি।"

কালিদাস বল্লনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আদেশ মত ঐ কবিতাই লিখিয়া দিলেন। ইহাতে বল্লনের মনে বড় হর্ষোদয় হইল। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, একটা দিগ্‌গজ কবি আসিয়াছে; রাজা, হয় ত, তাঁহার কবিতা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বল্লনকে স্থানচ্যুত করিবেন; অধুনা কালিদাসোক্ত-শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা দূরীভূত হইল।

+ পূর্ব্বার্দ্ধে 'ট', এবং পরার্দ্ধে 'কুক্কু' মিলিয়া 'কুক্কুট'! একটি অনুষ্টুভে স্ম, চ, বৈ, তু, হি এই পাঁচটি নিরর্থক পাদপূরক অব্যয়, তাহার মধ্যে চারিটির দ্বিরাবৃত্তিও ঘটিয়াছে।

যথা সময়ে তিনি কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় চলিলেন—হস্তে কালিদাসের রচিত "প্রভাত-বর্ণনা!" পথে একটা বৃষ দেখিয়া তিনি পুনশ্চ কালিদাসকে একটী কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস কহিলেন—

"গোরপত্যং বলীবর্দ্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে তস্য শৃঙ্গঞ্চাপিতু বর্ত্ততে॥

গরুর বেটা বলদ, সে মুখে ঘাস খায়, তার লেজ আছে, শিংও আছে!

এবার কালিদাসের মূর্খত্ব বিষয়ে বল্লন নিঃসন্দেহ হইলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে কালিদাসকে লইয়া রাজসভায় আগমন করিলেন। সভাসদ বল্লনকবিকে সমাগত দেখিয়া রাজা প্রণাম করিলেন। বল্লন আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু"—

হে রাজন্! জয় হউক।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব?"

বল্লনকবে! আপনার হস্তে কি?

বল্লন। "শ্লোকঃ।"

একটি কবিতা।

রাজা। "কস্য?"

কাহার রচিত?

বল্লন। "কবেরমুষ্য কৃতিনঃ।"

এই আগন্তুক নিপুণ কবির রচিত।

রাজা। "তৎপঠ্যতাং"

উহা পাঠ করুন।

এই সময়ে কালিদাস আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না; বল্লন তাঁহার "প্রভাত বর্ণন" পাঠ করিতে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, তিনি তাহাতে বাধা দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রাজার নির্দেশের উত্তরে বলিলেন—

পঠ্যতে। *

কিন্ত্বাসামরবিন্দ সুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা-
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লী-কঙ্কণ ঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাং॥"

"পড়া যাইবে। কিন্তু এই সকল কুবলয়নেত্রা সুন্দরীগণ ঘন ঘন চামরান্দোলন করাতে, তাহাদের হস্ত-সঞ্চালন-জনিত কঙ্কণ-ঝনৎকারে কিছুই শুনা যাইবে না—ক্ষণকাল উহা বারণ করুন।"

অদ্য আমাদিগের লেখনীও এই স্থানেই বিশ্রাম করুন।

সাহিত্য সেবক আশ্বিন ১৩০৩

---

* সমগ্র শ্লোকার্দ্ধ এই—"রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্যকৃতিনস্তৎ পঠ্যতাং পঠ্যতে।"

কালিদাসের কাহিনী।

---

(১) কর্ণাট রাজ প্রশস্তি।

কালিদাস বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমল্লাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরীনৃত্যতে
তদ্দৃষ্ট্বা কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধা গুণৈঃ।
কীর্ত্তিশ্চন্দ্র করীন্দ্র কুন্দ কুমুদ ক্ষীরোদনীরোপমা
ত্রাসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য ভবতো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

হে রাজন্, সপত্নী সরস্বতী তোমার বদনবিবরে সতত নৃত্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও কমলা চঞ্চলা হইলেও ত্বদীয় গুণরাশি দ্বারা আবদ্ধা হইয়া তোমাতেই বিরজমানা রহিয়াছেন। চন্দ্র, ঐরাবত, কুন্দ, কুমুদ এবং ক্ষীরোদনীরের সহিত যাহার উপমা সম্ভবে, ঈদৃশী ভবৎ-কীর্ত্তি * (কমলার বন্ধনাবস্থা দর্শনে যেন) ত্রাসিতা হইয়া সাগর পার হইয়াও বিশ্রামলাভ করিতে পারিতেছে না।

যশোমুক্তাভিস্তে গুণিবর গুণৌঘৈঃ কমলভূ-
রতি প্রেম্না হারং গ্রথিতুমতুলং যত্নমকরোৎ।

---

* "যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাস-কীর্ত্ত্যোঃ"—সাহিত্য-দর্পণ।—কীর্ত্তিতে 'ধবলতা' আরোপকরা একটি কবি-সময়-প্রসিদ্ধি।

গুণান্তং মৌক্তং বা গুণবিবরমালোক্য ন চিরা-
দ্রুষা ক্ষিপ্তাস্তেন ক্ষিতিতিলক তারা বিয়তি তাঃ ॥

হে গুণিবর, কমলযোনি ব্রহ্মা ত্বদীয় যশোরূপ মুক্তাসমূহ লইয়া তোমার গুণাবলী দ্বারা অতি আদর করিয়া একটি হার গাঁথিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গুণের অন্ত কিংবা মুক্তায় ছিদ্র না পাইয়া বিরক্ত হইয়া তিনি ঐ মুক্তারাশি ছড়াইয়া ফেলিয়া দেন; হে নরপাল, ঐগুলি সম্প্রতি নক্ষত্র রূপে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে।

শ্রীমন্নাথ ভবদ্যশোবিটপিনঃ খেতারকাঃ কোরকা-
স্তেষামেকতমঃ পুরা বিকশিতো যঃ পুর্ণিমাচন্দ্রমাঃ ॥
তেনেদং মকরন্দসুন্দরসুধাস্যন্দৈর্জগন্মণ্ডিতং
শেষেষেষু বিকশ্বরেষু ভবিতা কীদৃঙ্ ন জানীমহে ॥

হে নরনাথ, আকাশের তারকারাজি তোমার যশোবৃক্ষের কোরক। উহাদের একটি পুরাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া পূর্ণিমার চন্দ্র হইয়াছে। তাহা হইতে ক্ষরিত মকরন্দ সদৃশ সুধাধারা দ্বারা জগৎ আপ্যায়িত হইয়াছে। না জানি অবশিষ্ট সকলগুলি (তারকাকোরক) বিকসিত হইলে কিরূপ শোভাই হইবে!

ত্বদ্বাহুব্যূহবেগক্ষতধরণিতলে বৈরিবামাশ্রুপঙ্কে
ক্ষিপ্তোন্মত্তেভকুম্ভস্থল দলন বশান্মৌক্তিকন্তত্র বীজম্।
তজ্জাতা কীর্ত্তিবল্লীগগনবনচরীমূলমস্যাঃ ফণীন্দ্রঃ
শুভ্রাণ্যভ্রাণি পত্রাণ্যুড়ুগণকলিকাশ্চন্দ্রমাঃ ফুল্লপুষ্পম্ ॥

তোমার বাহুবলে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত হইয়া (যেন) চষিত

হইয়াছে ; তাহাতে শত্রুনারীগণের অশ্রুধারা পতিত হইয়া কর্দ্দম হইয়াছে ; উঁহাতে মদমত্ত মাতঙ্গের বিদারিত কুম্ভস্থল হইতে মুক্তা বীজরূপে পতিত হইয়া তোমার কীর্ত্তিলতার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই কীর্ত্তিলতা আকাশরূপ কাননে অদ্যাপি বিরাজিত ; ফণিরাজ অনন্ত ইহার মূল, শুভ্র মেঘগণ ইহার পত্র, নক্ষত্রসমূহ ইহার কলিকা এবং চন্দ্রমা ইহার বিকশিত কুসুম।

ধীর ক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণ্যলক্ষ্মীমুষ-
স্ত্বৎকীর্ত্তেস্তুলনাং কলঙ্কমলিনো ধত্তে কথং চন্দ্রমাঃ।
স্যাদেবং ত্বদরাতিসৌধশিখরে প্রোদ্ভূতশষ্পাঙ্কুর-
গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্ যদি পুনস্তস্যাঙ্কশায়ী মৃগঃ॥

হে ধীর, ক্ষীর সমুদ্রের নিবিড় লহরী লীলার যে সৌন্দর্য্য, তত্তুল্য শোভাশীলা তোমার কীর্ত্তির সঙ্গে কলঙ্কমলিন চন্দ্রের কিরূপে উপমা সম্ভবে ? তবে উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি তোমার নির্জ্জিত শত্রুগণের সৌধশিখরে জাত শষ্পাঙ্কুর ভক্ষণার্থে ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রের ক্রোড়স্থ মৃগ বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

সংগ্রামাঙ্গনমাগতেন ভবতা চাপে সমাসাদিতে
দেবাকর্ণয় যেন যেন সহসা যদ্‌যৎসমাসাদিতম্।
কোদণ্ডেন শরঃ শরেণ হি শিরস্তেনাপি ভূমণ্ডলং
তেন ত্বং ভবতাপি কীর্ত্তিরতুলা কীর্ত্ত্যাচ লোকত্রয়ম্॥

হে দেব, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তোমার ধনুঃ ধারণ করিবামাত্রেই সহসা কোন্ কোন্ বস্তু কি কি প্রাপ্ত হইল, তাহা শুন—ধনুঃ বাণ [প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ ধনুতে বাণ যোজিত

হইল)]; বাণ শত্রুর শির (পাইল); সেই শির পৃথিবী; পৃথিবী তোমাকে; তুমি অতুল কীর্ত্তি; এবং সেই কীর্ত্তি ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইল।

পাঠক, এই সকল শ্লোক পড়িয়া কি রঘু-মেঘ-কুমার-রচয়িতার কবিতা বলিয়া বোধ হয়? ধন্য রে কিংবদন্তি! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই চতুষ্পাঠীর সরল-বুদ্ধি ভট্টাচার্য্যবর্গ ও অন্তেবাসিগণকে কি কুহকেই ফেলিয়াছিস্ যে তাঁহারা এই সকল অর্ব্বাচীন কবিকল্পের লেখনী-কণ্ডূয়নজাত "হিণ্ডীর-পিণ্ডী"কে ভারতীর বরপুত্রের স্কন্ধে চাপাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না!

যাহা হউক, রাজা এতক্ষণ কালিদাসের অভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এই সকল শ্লোক শ্রবণানন্তর বিপরীত দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিলেন। এই সকল কবিতার পুরস্কার স্বরূপ রাজা সম্মুখস্থ রাজ্যবিভাগ কবিকে মনে মনে দান করাতেই রাজার এই পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের কারণ; কিন্তু কালিদাস বুঝিলেন অন্যরূপ। তাই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
হে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি ভূধরাম্বুদনদীভূভাগবৃন্দাটবী
বাত্যামারুত চন্দ্র চন্দনগণাস্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

হে কর্ণাটরাজ, প্রত্যুপকারে কাতরতা নিবন্ধন পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিও না, আমার সুধাময়ী শ্লোকাবলী শ্রবণ কর। পর্ব্বত, মেঘ, নদী, প্রদেশ, বন, ঝড়, বায়ু, চন্দ্র, চন্দন প্রভৃতি কত কি বর্ণনা করিয়াছি, উহাদের হইতে আমি কবে কি প্রাপ্ত হইয়াছি?

অর্থাৎ, কিছু পাইবার আশায় কালিদাস ভারতীপ্রয়োগ করিতে আসেন নাই; আর, এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনেও কালিদাসের কিছু আসে যায় না :—

পুরো বা পশ্চাদ্বা কচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে
তদা কা নো হানির্বচনরচনৈঃ ক্রীতজগতাং।
বনে বা হর্ম্ম্যে বা কুচকলসহারে মৃগদৃশাং
মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজসুভগস্য দ্যুতিমতঃ॥

বাক্যরচনা দ্বারা জগৎক্রয়কারী আমাদের পুরোভাগে অবস্থানেই বা গৌরব কি, এবং পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান ঘটিলেই বা হানি কি ? অকৃত্রিম উজ্জ্বল মণি বনেই পড়িয়া থাকুক, প্রাসাদেই রক্ষিত হউক, অথবা সুন্দরীর কুচোপশোভী হার মধ্যেই গ্রথিত থাকুক, উহার মূল্য তুল্যরূপই থাকিবে। *

অবশ্য, ক্ষণকাল পরেই রাজা ও কবিতে আপোষ হইল। বেচারা বন্ধন কাণ্ড দেখিয়া বোধ হয় অবাক্ হইয়া গেল !

রাজার কিন্তু 'সুধাসিক্তসূক্ত'রসপ্রিপাসা মিটিল না। তিনি শৈব ছিলেন, কবিকে স্বকীয় ইষ্টদেব রুদ্রের বর্ণনা করিতে বলিলেন। শুনিবার দোষে 'রুদ্র' স্থলে কবি বুঝিলেন 'সমুদ্র'; তাই বলিলেন—

কিংবাচ্যো মহিমা মহাজলনিধের্যস্যেন্দ্রবজ্রাহতি-
ত্রস্তো ভূভৃদমজ্জদম্বুনিচয়ে কুলীরপোতাকৃতিঃ।

* সাটোপ ভাব টুকু বাদ দিলে এই দুইটি শ্লোক কালিদাসের লেখনীর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মৈনাকোঽতিগভীরনীরবিলসৎপাঠীনপৃষ্ঠোল্লস-
চ্ছৈবালাঙ্কুরকোটিকোটরকুটীকুট্যন্তরে সংস্থিতঃ॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাহত হইবার ভয়ে মৈনাক পর্ব্বত কঙ্কট-শাবকের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া যাহার গভীর নীরে বিচরণকারী কোনও পাঠীন মৎস্যের (বোয়াল মাছ, ইতি ভাষা) পৃষ্ঠলগ্ন শৈবালাঙ্কুরের কোটি কোটি কোটরের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল, সেই মহাসমুদ্রের মহিমা আর কি বলিব ?

রাজা একটু হাসিলেন।—শ্লোকের উৎকটত্ব নিমিত্ত নহে, কেন না ঈদৃশ গল্পাধিনায়ক রাজন্যবর্গের যেন একটু স্বাভাবিক রসবধিরতা ছিল, এইজন্য এতাদৃশী "কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী" শ্লোকাবলী ভিন্ন অপর মৃদুতর রচনা তাঁহাদের শ্রবণ বিবরাভ্যন্তরে বোধ হয় পৌঁছিত না ; রাজা রুদ্রবর্ণনা করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাই কি রুদ্রবর্ণনা ? কবি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন, তাই বলিলেন, হাঁ মহারাজ, ইহাই রুদ্রবর্ণনা ; এখনও ত বর্ণনা শেষ হয় নাই,—

ঈদৃক্ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতা মহীভূভৃদ্ভিরভ্রঙ্কষৈ-
স্তাবদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতা পৃথুপৃথুদ্বীপৈঃ সমন্তাদিয়ং।
যস্য স্ফারফণামণের্নিমিলিতা তির্য্যক্ কলঙ্কাকৃতিঃ
শেষোঽপ্যেকমগাদ্‌যদঙ্গদপদং তস্মৈ * * * ॥

ঈদৃশ সাতটা সমুদ্র এবং ঐ সংখ্যক বিমানস্পর্শী পর্ব্বত দ্বারা মণ্ডিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত এই যে পৃথিবী, উহা যাহার শিরঃস্থিত স্বচ্ছ মণিতে সংলগ্ন হওয়াতে মণির কলঙ্কের ন্যায় প্রতিভাত হয়, সেই নাগরাজ শেষও যাঁহার কেয়ূর

রূপে একতম অঙ্গের ভূষণ মাত্র, তাঁহাকে———,এইমাত্র বলিয়া "বেটা বল্ ত রে" বলিয়া কবি শ্লোকের সমাপ্তি করিলেন। নিকটে ভৃত্যরূপী বররুচি দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বলিলেন "নমঃ শম্ভবে"। * কালিদাস নাকি শিবের নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই এই বিড়ম্বনা!

কিন্তু, রে কুহকিনি কিংবদন্তি, ধন্য তোর সাহস! "বেটা বল্ ত রে" এই নিতান্ত আধুনিক প্রাকৃত বাঙ্গালা বুলিটাও কি কালিদাসের মুখনিঃসৃত বলিয়া বাজারে বিকাইতে চাহিয়াছিলি? তোর কি এটাও খেয়াল হইল না যে 'উজ্জয়িনীর' উজ্জ্বল রত্ন, 'বিক্রমাদিত্যের' সভাসদ, কালিদাস বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার জন্মের বহুপূর্ব্বে এবং বঙ্গদেশের বহুপশ্চিমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? † তোর অমূলকত্বের ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে?

এখানেই কালিদাসের এই কর্ণাটবিজয় কাহিনী শেষ হইত। কিন্তু রাজা ছাড়িবার পাত্র নহেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং" ইত্যন্ত শ্লোকটি "কর্ণাটরাজপ্রিয়া," কি স্বয়ং কর্ণাটরাজ, কাহারই মনোনীত হয় নাই। তাই কালিদাসকে

* সুতরাং শ্লোকের শেষ পদটি হইল—

"শেষোঽপ্যোকনগাদবদঙ্গদপদং তস্মৈ নমঃ শম্ভবে॥"

† কিন্তু "কালিদাস" এই নামটি বঙ্গজ এবং আধুনিক বলিয়াই প্রতীত হয়; কিং-বদন্তীর বোধ হয় উহাতেই এই সাহস। অনেক স্থলে কালিদাসকে দিয়া বাঙ্গালা প্রশ্নেরও উত্তর বঙ্গভাষায়ই দেওয়ান হইয়াছে।

বিদ্রূপ করিবার নিমিত্তই যেন রাজা "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং" এই কথাটি দুই একবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভাব বুঝিয়া, কবি ঐ কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া 'তৎক্ষণাৎ শ্লোক রচনা করিলেন—

উগ্রগ্রাহসমুদগতো জলমতিক্রামত্যনালম্বনে
ব্যোম্নি ভ্রাম্যতি দুর্জ্জয়ক্ষিতিভুজাং মূর্দ্ধানমারোহতি।
ব্যাপ্তুং যাতি বিষাকুলৈরহিকুলৈঃ পাতালমেকাকিনী
কীর্ত্তিস্তে মদনাভিরাম "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং"॥

হে মদনসুন্দর, তোমার কীর্ত্তি কোন অবলম্বন বিনাই একাকিনী ভীষণ হাঙ্গরসমাকীর্ণ সমুদ্রবারি অতিক্রম করিতেছে; আকাশোপরিস্থ স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছে; দুর্জ্জয় নৃপতিগণকে নির্জ্জিত করিয়া তাঁহাদের মস্তকোপরি আরোহণ করিতেছে; এবং বিষধরসর্পসমূহাকীর্ণ পাতাল প্রদেশেও গমন করিতেছে। ইহাতে বোধ হয় স্ত্রীলোকের ভয় কৃত্রিম মাত্র।

এই রূপে কবির কৃতিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া রাজার আর কিছু বক্তব্য রহিল না—বিজয়সূচক জয়পত্র লিখিয়া দিয়া তাঁহার যথোচিত 'মর্য্যাদা' বিধান করিলেন। বলা বাহুল্য, জয়পত্রসহকৃত কবি বিক্রমাদিত্যসভায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিক্রমাদিত্যও হৃষ্টচিত্তে কবিকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।

[সাহিত্যসেবক অগ্রহায়ণ ১৩০৩।

কালিদাসের কাহিনী।

(৫) নানা সমস্যাপূরণ।

কর্ণাটরাজের ন্যায় ধারানগরাধিপতি ভোজরাজেরও অশেষ বিদ্বদ্বৃন্দপরিশোভিত রাজসভা ছিল। * এই সভার পণ্ডিতগণের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইঁহারা সকলেই শ্রুতিধর ছিলেন এই সভাতে আসিয়া কেহ কোন কবিতা বলিলে সভাস্থ পণ্ডিতগণ তৎক্ষণাৎ উহা আবৃত্তি করিতেন এবং শ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। সুতরাং ভোজরাজসভায় কেহ "নূতন" কবিতা বলিতে পারিতেন না। ভোজরাজও ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যিনি নূতন শ্লোক শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা যাইবে।"

ইদানীন্তন 'পণ্ডিত'গণের ন্যায় কালিদাস নিতান্ত "সরল" ছিলেন না; তিনি উক্ত ঘোষণাশ্রবণে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়া কূটবুদ্ধিবলে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সহসা একদিন ভোজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

---

* ইতিপূর্ব্বে কালিদাস কর্ত্তৃক কর্ণাট সভা বিজয়ের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহার আর একটি সংস্করণ আছে, সেইটি ভোজরাজের সভা বিজয়। পুনরুক্তি দোষাশঙ্কায় এই কাহিনী পরিত্যক্ত হইল। কর্ণাট রাজ বর্ণনার শ্লোকগুলির ন্যায় ভোজ-রাজ স্তুতিও বাগাড়ম্বরপরিপূর্ণ স্বল্পভাববিশিষ্ট কতিপয় শ্লোকসমষ্টি মাত্র। অন্যান্য ঘটনা উভয়ত্রই অবিকল এক।

"স্বস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটী মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নোবা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং ততো মে॥"

ত্রিভুবনবিজয়ী ধর্ম্মিষ্ঠ সত্যপরায়ণ শ্রীমান্ ভোজরাজের জয় হউক। মহারাজের পিতৃদেব আমা হইতে এককোটী নিরনব্বুই লক্ষ রত্ন ধার করিয়াছিলেন, উহা ত্বরায় আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। ইহা যে সত্য, এই সকল পণ্ডিতেরাই বিদিত আছেন; যদি উঁহারা না জানেন, তবে ইহা আমার নূতন রচিত শ্লোক বলিয়া আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

বলা বাহুল্য, ভোজরাজ এবং তৎসভাস্থ পণ্ডিতগণ ইহাতে বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিলেন। তদবধি ভোজরাজের সহিত কালিদাসের পরম সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। *

বীরশ্রীমণ্ডিত শূরগণ যেমন পরদেশবিজয় এবং শত্রু হইতে স্বদেশরক্ষা এই দ্বিবিধ উপায়ে স্বকীয় বীর্য্যবল প্রদর্শিত করেন, বিচারমল্ল পণ্ডিতগণও তদ্রূপ অপর সভাবিজয় এবং বিজিগীষু পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় সভার গৌরব রক্ষা দ্বারা

* "ভোজপ্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে ধারানগরাধিপ ভোজরাজের সভায় কালিদাসের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক উক্ত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পারেন; অধুনাতন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই কালিদাসকে উজ্জয়িনীর সভাসদ ভারতীর বরপুত্র হইতে পৃথক্ করিয়া "ভোজ-কালিদাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভোজ-প্রবন্ধের কালিদাস স্বয়ং আপনাকে বিক্রমাদিত্যের কালিদাস বলিয়াই পরিচয়প্রদান করিয়াছেন।

নিজের কৃতিত্ব খ্যাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং এদিকে যেমন কর্ণাট ভোজ প্রভৃতি রাজসভা বিজয় করিয়া কালিদাস স্বকীয় কীর্ত্তিনিশান উত্তোলিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিক্রমাদিত্য-সভাবিজিগীষু অপর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের দর্প চূর্ণ করিয়া উহা অক্ষুণ্ণভাবে সমুচ্ছ্রিত রাখিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদা এইরূপ কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভায় আসিয়া আপন পাণ্ডিত্য বল ঘোষণা করিয়া দিলেন। নৃপতি কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া পণ্ডিত স্নানাহ্নিকার্থ সরোবরে গমন করিলে কালিদাস নারীবেশে কলসীকক্ষে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঐ পণ্ডিতের প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দিগ্বিজয়ী কহিলেন—

"কিং মাং নু পশ্যসি ঘটেন কটিস্থিতেন
বক্ত্রেণ চারুপরিমীলিতলোচনেন।
অন্যং বিলোকয় জনং তব কর্ম্মযোগ্যং
নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি॥"

সুন্দরি! কক্ষে কলসী লইয়া ঈষন্মুকুলিত নয়ন দ্বারা আমাকে কেন নিরীক্ষণ করিতেছ? তোমার উপযুক্ত অন্য কাহারও নিকট গমন কর; ঘড়া বহিতে বহিতে যাহার কোমরে দাগ পড়িয়া গিয়াছে এমন রমণীকে আমি স্পর্শও করি না। *

* ইতিপূর্ব্বে একস্থলে বলা হইয়াছে "কালিদাস সুশ্রীক পুরুষ ছিলেন"—এতৎকাহিনী-বর্ণিত ঘটনা উহার একটি অবান্তর প্রমাণ।

পণ্ডিতের এই অবজ্ঞাসূচক সাটোপ বাক্য শুনিয়া রমণীরূপী কালিদাস সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলেন—

"সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজবাণপীড় !
নাহং ত্বদর্থমনসা পরিচিন্তয়ামি।
দাসোঽদ্য নো বিঘটিতস্তবতুল্যরূপী
স বা ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ ॥"

হে কামাকুলিতচিত্ত পণ্ডিত, সত্যই বলিয়াছ ! বস্তুতঃ আমার অন্তঃকরণে তোমার বিষয়ে ভাবনা উপজাত হয় নাই। আমাদের চাকর, ঠিক তোমারই ন্যায় আকৃতি, আজ কোথা পলাইয়া গিয়াছে,—তোমাকে দেখিয়া "এই বা সেই" এই চিন্তাই করিতেছিলাম।

কলসবাহিনীর মুখে এইরূপ ব্যঙ্গপূর্ণ রসিকতার আস্বাদ পাইয়া দিগ্বিজয়ী চমৎকৃত হইলেন, এবং রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কালিদাসের পরিচারিকা বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিল। পণ্ডিত মনে ভাবিলেন, যাহার পরিচারিকাই ঈদৃশ পাণ্ডিত্যসম্পন্না সেই কালিদাস না জানি কত বড় পণ্ডিত। এই ভাবিয়া পুনশ্চ রাজসভায় না গিয়া দিগ্বিজয়ী হতাশচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ যেন ঈসপ-কথিত "ব্যাঘ্রের দ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন" !

অন্যদা কোন দিগ্বিজয়ী * বিক্রমাদিত্য সভায় আসিয়া "নষ্টস্য কান্যাগতিঃ" এই সমস্যা দিয়া উহা পূরণ করিতে বলেন।

* কেহ বলেন, 'রাক্ষস'। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নাম 'রাক্ষস' দেখা যায়—যথা, মুদ্রারাক্ষসের অধিনায়ক নন্দবংশের কুলমন্ত্রী।

কালিদাস তখন উপস্থিত ছিলেন না; অপর পণ্ডিতগণ উহার সদুত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় দিগ্বিজয়ী তিন দিনের সময় দিয়া বলিলেন, এই তিন দিনের মধ্যে সমস্যা পূরিত না হইলে রাজসভার পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। ইতিমধ্যে কালিদাস আসিলেন এবং এই ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক ভিক্ষুবেশে ঐ প্রশ্নকর্ত্তার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত পণ্ডিত ভিক্ষা প্রদানার্থ অন্যান্য দ্রব্য দিতে উদ্যুক্ত হইলে ভিক্ষুক, মাংস না হইলে চলে না, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুকের এই স্পর্দ্ধা অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া দিগ্বিজয়ী বলিলেন—

"ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে ?"

হে ভিক্ষুক, তুমি মাংসভক্ষণ কর ?

ভিক্ষুরূপী কালিদাস বলিলেন ঃ—

"কিং তত্র মদ্যং বিনা ?"

তাহাতে আবার মদ্য না হইলে কি চলে ?

দি। "মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং ?"

মদও তোমার প্রিয় পদার্থ ?

কা। "প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।"

বিলক্ষণ প্রিয়, তবে বারাঙ্গনার সঙ্গে হইলেই ভাল।

দি। "বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং ?"

বেশ্যার প্রয়োজন হইলে ত টাকা চাই, তুমি টাকা কোথায় পাইবে ?

কা। "দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা"

জুয়া খেলিয়া কিংবা চুরি করিয়া।

দি। "চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽস্তি ভবতঃ ?"

তোমার জুয়া খেলার ও চুরি করার ঝোঁকটুকুও আছে ?

কা। "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ॥" *

নষ্টের অন্য কি গতি আছে ?

ঈদৃশ অভাবনীয় উপায়ে সমস্যা পরিপূরিত হইতে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং পূরণকারী ছদ্মবেশী কালিদাসকে ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল কার্য্যে কালিদাস ছদ্মবেশ ধারণ করিতেই যেন একটু আমোদ পাইতেন। সুচতুর যোদ্ধা যেমন সঙ্গোপনে একবারে শত্রুর শিবির অধিকার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত বিপক্ষেরও অনায়াসে পরাজয় সাধন করেন, কালিদাসও তদ্রূপ আপনাকে গোপন রাখিয়া প্রতিপক্ষের অভাবনীয় উপায়ে তাহাকে চমৎকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেন। কবিবরের এই সম্মুখ-যুদ্ধে বৈমুখ্য বিষয়েও কিংবদন্তী একটি কাহিনী প্রচারিত করিয়াছে।

একদা দেবী সরস্বতী স্বীয় বরপুত্রের কৃতিত্ব পরীক্ষার্থ বালিকা বেশ ধারণ করিয়া একটি ছিন্নপত্রে এক শ্লোকের

---

* সমগ্র শ্লোকটী এই—

"ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে কিংতত্র মদ্যং বিনা
মদ্যঞ্চাপি তবপ্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপার্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা
চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ॥"

প্রথমার্দ্ধ ভাগ লিখিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

আমার স্বর্গীয় জনক একটি শ্লোক রচনা করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন, আমি এই পত্রে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে উহার শেষার্দ্ধটুকু এই পত্রের অর্দ্ধাংশের সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—আপনাদের কেহ যদি দয়া করিয়া উহা বলিয়া দিতে পারেন, চিরবাধিত হইব। শ্লোকার্দ্ধটি এই—

"যাতু যাতু কিমনেন তিষ্ঠতা
মুঞ্চ মুঞ্চ সখি সাদরং বচঃ।"

কোন মানিনী প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন—সখি! উহাকে এখানে থাকিবার জন্য এত মিষ্ট বাক্য বলিতেছ কেন? যাইতে দাও।

রত্নগণের মধ্যে একজন শ্লোকটি এইরূপ পূরণ করিলেন—

"পামরীবদনলোলুপো যুবা
নোহি বেত্তি কুলজাধরামৃতং॥"

বেশ্যার বদনমধুতে যার আসক্তি সে কি কখন কুলবধূর অধরামৃত পানের স্বাদ বুঝে?

উহা শুনিয়া বালিকা বলিলেন, "আমার যতদূর স্মরণ হয়, পিতার শ্লোকটি এইরূপ ছিল না।" তখন অপর পণ্ডিত বলিলেন—

"কোকিলাকলরবো বনে বনে
নূনমস্য নিগড়ো ভবিষ্যতি ॥"

কাননে কাননে উদ্দীপক কোকিলার কুহুস্বর ধ্বনিত হইতেছে, উহাই ইহার নিগড় স্বরূপ (অত্রাবস্থিতির কারণ) হইবে।

উহাতেও বালিকার তৃপ্তি হইল না দেখিয়া স্বয়ং মহারথী কালিদাস উত্তর করিলেন—

"নূনমেষ মদপাঙ্গনির্জিতো
যন্ত্রতঃ কতি পদানি গচ্ছতি ?"

আমার কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া এ আর কয় পা চলিতে সমর্থ হইবে ?

ইহাতেও প্রশ্নকারিণী সন্তুষ্টা হইলেন না দেখিয়া কালিদাস বিষম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বালিকার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। বাগ্দেবী তখন প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, পণ্ডিতের ঈদৃশ ক্রোধবশীভূত হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। তুমি আমারই কৃপায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী বিদ্বান্ ও কবিকুল-চূড়ামণি হইয়াছ বটে, কিন্তু আমার অভিশাপে সম্মুখবিচারে তোমার পাণ্ডিত্যের স্ফূর্ত্তি পাইবে না, সুতরাং জয়লাভও ঘটিবে না।" *

* সম্মুখবিচারে কালিদাসের পরাভূতির দৃষ্টান্তের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ মেছুনী ও কুম্ভকারের হস্তে কবিবরের দর্পচূর্ণের কাহিনী জনশ্রুতিতে প্রচারিত আছে। যাহা হউক, অবশেষে কালিদাসের অশেষ স্তুতি বিনতিতে প্রসন্না হইয়া বাগ্দেবী, কেবল একদিন সম্মুখ বিচারে জয়লাভ হইবে, এরূপ বর দেন ; ঐ একদিন নাকি কালিদাস বৃহস্পতি অধিষ্ঠিত ইন্দ্রের সভা জয় করেন।

ফলতঃ স্বকীয় সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষকে আপত্তি প্রদর্শন করিতে দেখিয়া যে পণ্ডিত ক্রোধে অধীর হন, বিচারক্ষেত্রে তিনি জয়-লাভ করিতে সমর্থ হন না।

এতাদৃশ সমস্যা পূরণে কালিদাসের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কোন কবি এক রাজমহিষীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজা জানিতে পারিয়া শাস্তি স্বরূপ কবিকে শূলারোপিত করেন। ঐ কবি স্বীয় শোণিত দ্বারা শূলের পার্শ্বে স্বকীয় দশাপরিণতিসূচক একটি শ্লোক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু—

"কেবা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ।"

এই ভূমণ্ডলে প্রফুল্ল পঙ্কজপরিশোভিত হংসমালাপরিবেষ্টিত কতই জলাশয় বর্ত্তমান আছে ;—

এই অর্দ্ধাংশ লিখিবামাত্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। রাজা এই শ্লোকার্দ্ধ দেখিয়া উহার অপরার্দ্ধ কীদৃশ হইবে এই কৌতূহলপরবশ হইয়া নানাদিগ্‌দেশস্থ পণ্ডিতগণকে উহা পূরণ করিতে দেন। কিন্তু কেহই উক্ত কবির মনোগত ভাবানু-রূপে কিংবা রাজার তৃপ্তিকররূপে উহা পরিপূরিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে কালিদাসসমীপে ঐ শ্লোকার্দ্ধ নীত হইলে তিনি এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন—

"কিং চাতকঃ ফলমবেক্ষ্য সবজ্রপাতাং
পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্।"

তবে তৃষিত চাতক কি ফল প্রত্যাশা করিয়া ইন্দ্রপ্রবর্ত্তিত বজ্রপাত সমন্বিত নবমেঘ বর্ষণের প্রতি তাকাইয়া থাকে ?

রাজা এই শ্লোকপূর্ত্তিতে নিরতিশয় প্রীত, হইয়া কবিবরের যথেষ্ট প্রশংসা ও পুরস্কার বিধান করিলেন।

আর একদিন কালিদাসের কোন বন্ধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং" এই প্রথম পাদ, এবং "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এই শেষ পাদ নির্দ্দেশিত করিয়া, আদিরসে একটি শ্লোক রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
স্পৃষ্ট্বা সখে দিব্যমহং করোমি।
যোগে বিয়োগে দিবসোঽঙ্গনায়া
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্॥

হে সখে! আমি এই পরম পবিত্র যজ্ঞসূত্র স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, প্রিয়তমার সঙ্গমে দিবস যেন অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বোধ হয়, আর তাহার বিয়োগে মহান্ অপেক্ষাও দীর্ঘতর জ্ঞান হয়।

এইরূপ সমস্যা পূরণের অনেক কাহিনী প্রচারিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এবারে এইস্থানেই শেষ করা গেল।

[সাহিত্যসেবক ফাল্গুন ১৩০৩।

কালিদাসের কাহিনী।

(৬) উপসংহার।

একদা এক রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের সভায় আসিয়া বলিল, "তন্নষ্টং"। যদি ত্রিরাত্র মধ্যে এই সমস্যার পূর্ত্তি না হয় তবে রাজ্য শুদ্ধ লোক সংহার করিয়া ফেলিব। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া রত্নগণ, মায় কালিদাস, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইলেন। পথে কালিদাস দেখিলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগ্নপদে প্রতপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া অতি ক্লেশে পথ চলিতেছেন; স্বভাবসুকুমার কবিহৃদয়ে দয়া উপজাত হইল,—কবি স্বীয় জীর্ণ পাদুকাযুগল ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বয়ং নগ্নপদে গমন করিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়াই তিনি একটি অস্বামিক সুসজ্জ অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তদারোহণে উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর উত্তীর্ণ হইলেন। এতদ্ ঘটনায় কবির মনে যে ভাবরাশি আবির্ভূত হইল, উহাতেই রাক্ষসের সমস্যা পূরিত হইল। কালিদাস রাজসভায় প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন—

"দ্বিজায় পাদুকা দত্তা শতবর্ষীয়জর্জ্জরা।
তৎফলাদশ্বলাভো মে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে॥"

বহু পুরাতন এক যোড়া জুতা ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলাম, তাহার ফলে একটা ঘোড়া পাইলাম। ফলতঃ যাহা দান না করা যায়, তাহাই নিষ্ফল।

সে যাত্রা এইরূপে রাক্ষসের হস্ত হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য রক্ষা পাইল।

আর একবার এক সমস্যা হইল "ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং ?" কালিদাস পূরণ করিলেন—

"গিরেস্তুল্যবিত্তং ন দানং ততঃ কিং ?
কুশাগ্রীয় বুদ্ধির্ন পাঠস্ততঃ কিং ?
বপুঃ কর্ম্মশক্তং ন তীর্থস্ততঃ কিং ?
ন ভর্ত্তুঃ প্রিয়ঞ্জীবিতঞ্চেত্ততঃ কিং ?"

পর্ব্বতপ্রমাণ ধন থাকিলেও দান না হইলে লাভ কি ? তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও যদি পড়াশুনা না থাকে তবে উহাতে ফল কি ? শরীরে শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তীর্থাদি পর্য্যটন না করিলে কি লভ্য হইল ? যদি স্বামী ভাল না বাসেন তবে বাঁচিয়া থাকায় কি ফল ?

ভারতীর বরপুত্রের ঈদৃশী ক্ষমতা ছিল যে অপরের যাহা জানা অসম্ভব তাহাও প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বলে তিনি দেখিতে পাইতেন। এই ক্ষমতা একবার তাঁহার সমূহ বিপত্তিরও হেতুভূত হইয়াছিল। কোন শিল্পী রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী ভানুমতীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নবরত্নাধিষ্ঠিত রাজসভায় আনয়ন করে। সকলেই উহার সবিশেষ প্রশংসা করেন, কিন্তু কালিদাস উহাতে যেন কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। ইহাতে শিল্পী ক্রোধভরে স্বীয় তুলিকা নিক্ষেপ করাতে এক বিন্দু মসী ঐ নগ্ন প্রতিকৃতির উরুদেশে পতিত হইল, তখন কালিদাস

"এইবার ঠিক্ হইয়াছে" এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সকলেই কালিদাসকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কবি বলিলেন, "রাজমহিষীর উরুদেশে একটি তিল আছে, শিল্পী অজ্ঞতাবশতঃ উহা চিত্রিত করিতে পারে নাই, এখন ভগ্নিক্ষিপ্ত তুলিকানিঃসৃত মসী বিন্দুতে উহা সংসাধিত হইয়াছে।"

কালিদাসের কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে মহিষীর গুপ্ত প্রণয়ী বিবেচনা করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কবি নিরুপায় ভাবিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গোপনে উজ্জয়িনীতেই কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজপুত্র মৃগয়া উপলক্ষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনের পথ না পাইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রজনী যাপনে কৃত সংকল্প হইলেন। ঐ বৃক্ষে জাম্বুবানের এক বংশধর অবস্থান করিতেছিল। শ্বাপদত্রস্ত রাজপুত্র উহার আশ্রিত হইয়া উহার সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিশ্রব্ধহৃদয ভল্লুক কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্র রাজপুত্রের ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গেলে হঠাৎ এক ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপুত্রকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আত্ম-প্রাণরক্ষার্থ রাজপুত্র তখন ভল্লুককে ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভল্লুক কোন মতে বৃক্ষাবলম্বন করিয়া রহিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে ভল্লুক সেই মিত্রদ্রোহী রাজপুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া "সসেমিরা"

এইমাত্র বলিয়া প্রস্থান করিল। পরে রাজপুত্র উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কেবল "সসেমিরা" এই বাক্য জপ করিতে লাগিলেন।

বহু চিকিৎসাদি করিয়াও রাজপুত্রের আরোগ্য হইল না; বিক্রমাদিত্য ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে রাজপুত্রকে সুস্থ করিতে পারিবে তাহাকে প্রভূত পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার লোভে অনেক চিকিৎসক আসিয়া অকৃতকার্য্য হইল। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন রাজা স্বীয় তনয়ের আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন। ছদ্মবেশী কালিদাস তখন আপন আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে আসিলেন, এবং রাজপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। রাজপুত্র আসিলে তাঁহার "সসেমিরা" উক্তি শুনিয়া স্ত্রীবেশী কালিদাস কহিতে লাগিলেন—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারোহ্য সুপ্তানাং হত্বা কিংনাম পৌরুষম্॥"

প্রণয়াবদ্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করাতে কি বাহাদুরী হইল? ক্রোড়শয়িত নিদ্রাগত ব্যক্তির বধসাধন করিতে যাওয়া কি পৌরুষের কার্য্য?

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥"

যাহারা ব্রহ্ম বধ করিয়াছে তাহারাও সেতুবন্ধে, সমুদ্রজলে বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন পূর্ব্বক পাপমুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর কদাপি মুক্তি নাই।

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥"

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, ঐ সকল ব্যক্তি যতদিন পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন নরক ভোগ করিবে।

"রাজর্ষে রাজপুত্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু ॥"

হে রাজন্! যদি রাজপুত্রের কুশল কামনা করেন, তবে ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান এবং ভক্তিভরে দেবতার্চ্চন করুন।

"সসেমিরা"র সমস্যা এইরূপে * পূরিত হইলে রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিলেন এবং অরণ্যের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ছদ্মবেশী কালিদাসকে বলিলেন

"গৃহে বসসি সুশ্রোণি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
কথং নৃশার্দ্দূলর্ক্ষাণাং বৃত্তান্তমবগচ্ছসি ॥"

হে সুন্দরি, তুমি বনে কখনও যাও না, গৃহে বসিয়া কিরূপে এই মনুষ্য, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র ঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইলে?

স্ত্রীবেশী কবি বলিলেন—

"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা ॥"

হে ভূপ, দেবতা ও গুরুদেবের কৃপায় আমার জিহ্বাগ্রে

* উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের আদ্য অক্ষর লইলে 'স সে মি রা" হইবে। এই গল্পটি বররুচি সম্বন্ধেও কহিত হইয়া থাকে।

সরস্বতী স্বয়ং বিরাজমানা ; আমি এই কারণেই এই সকল গুহ্য বৃত্তান্ত অবগত আছি, এই জন্যই ভানুমতীর তিলের কথাও জানি।

তখন বিক্রমাদিত্যের চৈতন্য হইল এবং ছদ্মবেশী রমণীকে কালিদাস জানিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

একদা কালিদাস স্বীয় পুত্রকে পড়াইতেছিলেন—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" দৈবাৎ ঐ পথ দিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যাইতেছিলেন ; রাজা কেবল স্বদেশে এবং বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্য, এই কথা তাঁহার অসহ্য হইল। তখন রাজাও কবি পরামর্শ করিলেন, উভয়েই আকৃতি গোপন করিয়া বিদেশে পর্য্যটন করিবেন, দেখা যাইবে কাহার কত সম্মান। কিছু দিন ভ্রমণ করিলে পর রাজার অর্থ ফুরাইয়া গেল ; অবশেষে স্বীয় হস্তের অঙ্গুরীয় বিক্রয় পূর্ব্বক উদর পোষণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে মণিকারের দোকানে গেলে ঐ ব্যক্তি উহাতে বিক্রমাদিত্যের নাম অঙ্কিত দেখিয়া ছদ্মবেশী রাজাকে চোর মনে করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক তদ্দেশীয় নরপতির সমীপে আনয়ন করিল। এদিকে কালিদাস ঐ দেশেরই নৃপতির সভায় আসিয়া বিদ্যাবলে রাজার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। চোর বেশে বিক্রমাদিত্য যখন রাজসভায় আসিলেন, তখন কালিদাস চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" তখন সমস্তই প্রকাশ পাইল, জগতে বিদ্যার গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।

কালিদাস তিথি বিশেষে মৌনাবলম্বন করিয়া ছদ্মবেশে থাকিতেন। এতদবস্থায় একদা রাজপুরুষেরা তাঁহাকে সামান্য লোক বিবেচনায় রাজার শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিয়া দিল। অনভ্যস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যেই কবিবরের শ্রান্তি জন্মিল; ইহাতে রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি॥"

রে মূঢ়, যদি তোর কাঁধে বেদনা ধরিয়া থাকে তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর্। "বাধতি" এই পরস্মৈপদী অশুদ্ধ প্রয়োগ শুনিয়া কালিদাসের মৌনব্রত ভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—

"ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে॥"

আমার কাঁধে তেমন ব্যথা বোধ হইতেছে না, যেমন আপনার মুখে "বাধতি" প্রয়োগ শুনিয়া বোধ হইল।

ইংলণ্ডীয় কবি গোল্ড্স্মিথের ন্যায় কবি কালিদাসও দান-কার্য্যে অপরিণামদর্শী ছিলেন। একদা সর্ব্বস্ব দান করিয়া, এমন কি পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিয়া, কবিবর আবক্ষঃ জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"অসম্যগ্ ব্যয়শীলস্য গতিরেতাদৃশী ভবেৎ।"

যাহারা ব্যয় করিতে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেনা, তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে!

কালিদাস উত্তর করিলেন—

"তথাপি প্রাতরুত্থায় নাম তস্যৈব গীয়তে ॥"

তথাপি লোক নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঐ ব্যক্তিরই নাম কীর্ত্তন করে, কৃপণের নাম কেহ লয় না।

কালিদাস অলোকসামান্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও, কিং-বদন্তীর মতানুসারে, তিনি নাকি তত "ভাবুক" ছিলেন না। তাই রাজা বিক্রমাদিত্য কবিতারসমাধুর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য একজন "ভাবুক" রাখিয়াছিলেন। কালিদাস কিন্তু এ বিষয়ে বড় রাজি ছিলেন না। তাই রাজা একদিন ভাবুকের আবশ্যকতা দেখাইবার নিমিত্ত কবি ও ভাবুক সমভিব্যাহারে সান্ধ্য সমীরণ সেবনার্থ বহির্গমন করিলেন এবং কবিকে মৃদুলবাতসঞ্চালিত একটি মুকুলিত আম্রবৃক্ষ দেখাইয়া উহা বর্ণনা করিতে বলিলেন। কবি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্ত মলয়াৎ
ত্বমেকা ত্বদ্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণেত্যুক্তা নবকুসুমিতা চূতলতিকা
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥

"সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি বহুদূর মলয়পর্ব্বত হইতে আসিয়াছি, তুমি একাকিনী আছ; হে বিলাসিনি, অদ্য রজনী তোমারই গৃহে যাপন করিতে ইচ্ছা করি।" পবন এই কথাগুলি বলিলে অচিরপুষ্পিতা চূতলতা যেন মস্তক বিকম্পিত করিয়া 'না' 'না' 'না' এইরূপ করিল।

কবি তদীয় শ্লোক যথারীতি ব্যাখ্যা করিলে রাজা প্রশ্ন করি-

লেন, 'নহি' এই শব্দটি তিনবার উক্ত হইল কেন? কবি ছন্দঃ ও অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পর্কীয় কারণ দর্শাইলে পর রাজা অসন্তুষ্ট চিত্তে ভাবুককে উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তখন ভাবুক বলিলেন, চূতলতাকে "নবকুসুমিতা" বলা হইয়াছে। "স্ত্রীরজঃ পুষ্পমার্ত্তবং।" ইহাতে, তিনবার 'নহি' বলাতে, "ত্রিরাত্র আমার সঙ্গে থাকা হইবে না" চূতলতা ইহাই সূচনা করিতেছে। তখন ঐ ভাবুকেরই জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

কালিদাস সমন্ধে এইরূপ নানা কাহিনী কিংবদন্তীমুখে প্রচারিত আছে, সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তথাপি কালিদাসের বেশ্যাসক্তি বিষয়ক দুইটি গল্প বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রবাদ আছে, কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্য একই বারবনিতাতে আসক্ত ছিলেন। ইহাতে উভয়ে পরস্পর কিছু ঈর্য্যান্বিতও ছিলেন। একদিন বিক্রমাদিত্য বারবনিতাকে শিখাইয়া দিলেন, "কালিদাস আসিলে তাহার মাথা মুড়াইয়া দিবে।" বারবনিতা তাহাই করিল, কিন্তু কালিদাসও উহাকে শিখাইয়া দিলেন, "তুমি রাজা আসিলে তাঁহাকে ঘোড়া সাজাইয়া তাঁহার উপর আরোহণ করিবে এবং তাঁহার দ্বারা ঘোড়ার হ্রেষারব করাইবে।" ঐ স্ত্রীলোক কালিদাসেরও অনুরোধ পালন করিল। অনন্তর পরদিন রাজসভায় সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে সমাসীন হইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে প্রশ্ন করিলেন—

"কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুণ্ডনং কুত্র তে কৃতং।"

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস! কোথা আপনার মুণ্ডন করা হইল?
কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

"যস্মিন্ ভবান্ হয়োভূত্বা চিঁহী শব্দমথাকরোৎ"

যেখানে মহারাজ ঘোড়া হইয়া হ্রেষা রব করিয়াছিলেন।
বিক্রমাদিত্য পরাস্ত হইলেন।

আর একদিন কালিদাস বারবনিতার ভবনে গিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্যও হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কালিদাস অমনি পার্শ্বস্থ গৃহে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। নানা হাস্য-পরিহাসের পর রাজা ঐ বনিতার স্তনযুগলে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

"তব তন্বি স্তনাবেতৌ নিয়তৌ চক্রবর্ত্তিনৌ।"

হে সুন্দরি! তোমার স্তনযুগল নিশ্চয়ই চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায়।
বিক্রমাদিত্য এই শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া অপরার্দ্ধ বলিতে না বলিতেই কালিদাস উত্তর করিয়া বসিলেন—

"আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ॥"

যেঁহেতু সাগরান্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র করগ্রহণকারী মহারাজাধিরাজ স্বয়ং উহাতে কর (অর্থাৎ হস্ত বা রাজস্ব) প্রদান করিয়া থাকেন।

ইহাতে রাজা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বারবনিতার গৃহ হইতে চলিয়া যান। রাজা রুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না, এবং কালিদাসই ইহার মুল, এই ভাবিয়া ঐ

পাপিষ্ঠা কালিদাসের বধ সাধন করিল। সরস্বতীর অভিশাপ সফল হইল। *

[সাহিত্য সেবক জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪



* ভোজ প্রবন্ধের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। উহাতেও কালিদাসকে লম্পট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবের পর ভোজসভায় আগমন করেন। তাহা হইলে কালিদাসের এই মৃত্যু কাহিনী নিশ্চয়ই অলীক। অপিচ, অষ্টসিদ্ধিযুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্য জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও বিলাসশূন্য ছিলেন; ইহাতে তদীয় বেশ্যাপরায়ণতার গল্পও অলীক বলিয়াই বোধ হয়।

কাদম্বরীর উপাদান।

সহৃদয় সংস্কৃত সাহিত্য সেবক মাত্রেই বোধ হয় মহাকবি বাণভট্ট কৃত কাদম্বরীর সমগ্র না হউক কোনও না কোনও অংশ অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু, কাদম্বরী রসভরে মত্ততানিবন্ধন, বোধ হয় অনেকেই কোন্ উপদানে এই কাদম্বরী প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহার অনুসন্ধানের অবসরও প্রাপ্ত হন নাই।

বড় বড় কাব্যকারগণ গ্রন্থ প্রণয়নে কুম্ভকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কুম্ভকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহার উপাদান মাটি, খড়, বর্ণ তুলিকা কিছুই তাহার নিজের প্রস্তুত নহে; কবিগণ কাব্যে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার একটিও নিজের নির্ম্মিত নহে। কুম্ভকার দুর্গামুর্ত্তি নির্ম্মাণ করে ধ্যানাদি পুরাণোক্ত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া; কালিদাস কুমারসম্ভব প্রণয়ন করিলেন শিবপুরাণ সমাশ্রয় করিয়া। কুম্ভকার যেরূপ বাজার হইতে বর্ণ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া প্রতিমার সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করে, সেইরূপ কবিও শব্দ ও কাব্য বাজার হইতে রস ও অলঙ্কার আহরণ করিয়া কাব্যের শোভা সম্পাদন করেন। সুদক্ষ কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার যেরূপ মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক জীব জন্তু প্রভৃতির অবিকল মুর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে, সুনিপুণ কবিগণও তেমনি প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে

মধ্যে মধ্যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় জনগণের হৃদয়াকর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কুম্ভকারের বাহাদুরী উপাদানের যথাস্থানে সন্নিবেশ করা, কবিরও চমৎকারিত্ব ঠিক্ ঐ স্থলেই। ফলতঃ অন্যস্থান হইতে উপাদান আহরণে যে কবির কি শিল্পকরের মহত্ত্বের কিছু হ্রাস হইবে এমন ভাব হৃদয়ে পরিপোষণ করা অসহৃদয়তার কার্য্য। কবি বলেন, "সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ"; আমরাও তাঁহারই সম্পর্কে বলিব, "সহস্রগুণ মুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং কবিঃ।"

যাহা হউক, বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীকথা কথাসরিৎসাগর হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগর আবার বৃহৎকথা নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। বৃহৎকথার কথামাত্র অবশিষ্ট আছে; গ্রন্থ খানি এখন আর দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐরূপ কত বৃহৎকথার যে লোপ হইয়াছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? নানা কথোপকথাবলীর সমষ্টীভূত কথাসরিৎসাগর বাস্তবিক অন্বর্থনামা, এবং কাদম্বরী, রত্নাবলী, নাগানন্দ ইত্যাদি অনেক রত্ন এই সাগর হইতে আহৃত হইয়াছে। প্রকাণ্ড কথাসরিৎসাগর যে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার সেই বৃহৎকথা যে কত বৃহৎ ছিল, তাহা সহৃদয়ের অনুমেয় মাত্র।

কথাসরিৎসাগর আরব্যোপন্যাসের ন্যায় নানাগল্পসমন্বিত। বাদশাহপত্নী শাহারজাদী স্বামী ও ভগিনীর চিত্ত বিনোদনার্থ নানা গল্পের অবতারণা করেন, তাহাতেই আরব্যোপন্যাসের গল্পবিন্যাস। কথাসরিৎসাগরেও বৎসরাজ, তৎপত্নী, কি তৎপুত্র,

নরবাহন দত্তের মনোরঞ্জনার্থ মন্ত্রী অমাত্য পারিষদ প্রভৃতির প্রমুখাৎ নানা গল্পের অবতারণা হইয়াছে।

একদা বৎস রাজের পুত্র নরবাহন দত্ত, কোনও এক দিব্যাঙ্গনার রূপলাবণ্যে মোহিত ও তদীয় পাণিপীড়নে লোলুপ হইয়া নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন ও বিরহানুভব করিতে করিতে অবশেষে হতাশ হইয়া পড়েন। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী গোমুখ তদীয় উৎকট আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন হতাশাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, সান্ত্বনার নিমিত্ত উপদেশচ্ছলে, অদ্ভুত শুক ও চণ্ডালদারিকার প্রস্তাবের অবতারণা করেন, এবং "এ জগতে মানবের ভবিতব্য মিলনাদি অতিদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেও ঘটিতে পারে" এই বলিয়া উহার উপসংহার করেন। সেই প্রস্তাবই প্রকৃত প্রস্তাবে কাদম্বরীর উপাদান।

উক্ত গল্পটি যদিও কাদম্বরীর প্রস্তাবের ন্যায় সুদীর্ঘ নহে, তথাপি উহার আয়তন এত ক্ষুদ্র নহে যে এতৎ পত্রের দ্বাদশ পৃষ্ঠেও উহার সঙ্কুলন হইবে। অথচ ইহার একটি ছত্রমাত্র বাদ দিলেই হয়ত গল্পের অবয়বের হানি হইবেক, ইহা এতদূর সংক্ষিপ্ত! কথাসরিৎসাগরের ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে গল্পটি লিখিত আছে। যাঁহারা কাব্যামোদী তাঁহারা উক্ত স্থানটি পাঠ করুন, বুঝিবেন কবি কীদৃশ সামান্য উপকরণ সম্বল করিয়া কিরূপ মনোহর বস্তু জগতের বিনোদনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কাদম্বরী সমগ্র বাণভট্টের রচিত নহে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ যে টুকু বাণ স্বয়ং রচনা

করিয়া গিয়াছেন, তাহার রক্তমাংসস্বরূপ অসংখ্য রূপকোপমোৎ-প্রেক্ষাপরিসংখ্যাসমন্বিত অশেষ সুদীর্ঘসমাসাঢ্যপদরাজিবিরাজিত শূদ্রকপুরী, বিন্ধ্যাটবী, জাবালির আশ্রম, অচ্ছোদ সরোবর, তপস্বিনী মহাশ্বেতার আশ্রম প্রভৃতির সুমধুর অথচ অতিবর্ণনাগুলি পরিত্যাগ করিলে যে অস্থিপঞ্জর নিরীক্ষিত হইবে, তাহা অবিকল কথাসরিৎসাগর হইতে উদ্ধৃত। তবে যে কিছু পার্থক্য, তাহা কেবল কথাস্থ নায়ক উপনায়ক প্রভৃতির নামকরণে এবং ঘটনাবলীর স্থান নির্দ্ধারণে। কিন্তু, কথা সরিৎ-সাগরস্থ প্রস্তাবের জ্যোতিষ্প্রভ, সোমপ্রভ, হর্ষবতী, কাঞ্চনাভ, মকরন্দিকা ইত্যাদি নামের সঙ্গে যথাক্রমে কাদম্বরীকথোল্লিখিত তারাপীড়, চন্দ্রাপীড়, বিলাসবতী, হেমকূট, কাদম্বরী প্রভৃতি নামের অর্থ ও ধ্বনিগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার কাদম্বরী কথাতে, চন্দ্রাপীড়ের পরিচারক ও পরিচারিকা মেঘনাদ ও পত্রলেখার সামান্য চরিত্র ভিন্ন, নূতন চরিত্র আর কিছুই সমাবেশিত হয় নাই বলিলেও চলে। ফলতঃ বাণভট্ট নূতন ঘটনা বা চরিত্র আবিষ্কারে বড় পারদর্শী ছিলেন না, ইহা কাদম্বরী (এবং হর্ষরাজের প্রকৃত জীবনীর ঘটনাবলম্বনে লিখিত হর্ষচরিত) দৃষ্টে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। কিন্তু তিনি যে প্রকার রচনামালা দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যে রূপ মনোহারি বর্ণনাদি দ্বারা কাব্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, শুকনাসের মুখে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি উপদেশ, চন্দ্রাপীড়ের মুখে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী মহাশ্বেতার পাতিব্রত্যের প্রশংসা, প্রভৃতি স্থলে

যে সকল জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্য সংসারে সচরাচর সুদুর্ল্লভ।

বাণভট্ট কাদম্বরীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ রচনা করিয়া পরলোকগত হইলে তদীয় উপযুক্ত পুত্র ভূষণ ভট্ট গল্পের শেষ কামনায় অপরাংশ স্বয়ং রচনা করেন। তাঁহার রচনা কিরূপ, পিতার রচনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, ইত্যাকার বিষয় অদ্য আমাদের আলোচ্য নহে; কিন্তু তাঁহার স্বরচিত কাদম্বরীর শেষাংশ এবং সরিৎসাগরস্থ গল্পের অবশিষ্টাংশ তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে তিনি কথা-সরিৎসাগরের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি কথাসরিৎসাগরের বিষয়ে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন ইহা কল্পনা করাও বাতুলত্ব মাত্র। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে পর্য্যন্ত অবলম্বনে বাণভট্ট পূর্ব্বার্দ্ধ লিখিয়া যান সৌভাগ্য বশতঃ সে পর্য্যন্ত কথাসরিৎসাগরের প্রস্তাবটি বেশ একটু সুসঙ্গত ও প্রীতিপ্রদ। কিন্তু ইহারই পর হইতে প্রস্তাবটি যেন হঠাৎ ও অসঙ্গতরূপে উপসংহৃত হইয়াছে। সুতরাং পিতার লিখিত অংশের সুসঙ্গতোপসংহার করিতে হইলে, বাণপুত্রের এতাদৃশ অসঙ্গতাংশ পরিহার ও সঙ্গত প্রস্তাবের নূতন কল্পনা করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। দৃষ্টান্ত স্থলে ধরুন, কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পের প্রারম্ভে কাদম্বরী-কথার ন্যায়, লিখিত আছে যে জ্যোতিষ্প্রভ (তারাপীড়)-মহিষী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাঁহার মুখে চন্দ্রমা প্রবিষ্ট হইতেছেন, এবং তজ্জন্যই নবজাত কুমারের নাম সোমপ্রভ (চন্দ্রাপীড়)

রাখা হয়। কথাসরিৎসাগরের গল্পের কোনও অংশে এই অলৌকিক ঘটনার আর কোনও উল্লেখ বা হেতুপ্রদর্শন কিছুই নাই। বাণপুত্র সেই ঘটনাটির উপর নির্ভর করিয়া, চন্দ্রও পুণ্ডরীকের পরস্পর অভিশাপ এবং তন্মূলক নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, যাহার কিছুমাত্র উল্লেখও কথা সরিৎ-সাগরে নাই। বস্তুতঃ বাণপুত্র শেষাংশে কথা সরিৎসাগরের অবলম্বন না করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, তাহা, যিনিই উভয় প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তিনিই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পুত্র, মাত্র পিতার গল্পটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, নিজের কল্পনার আশ্রয়ে, যতদূর সঙ্গতি সহকারে পারেন, গল্পটির উপসংহারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হইয়া পড়িল। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ দেখিলেন, বাণভট্টের কাদম্বরীকথার, ঐ কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পটিই প্রধান উপাদান। কিন্তু যে উপাদান প্রভাবে কাদম্বরী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেরই আদরণীয়া ও মনোমুগ্ধকরী, এবং কথাসরিৎসাগর হইতে সহস্রগুণে অধিকতর প্রসিদ্ধা, তাহা কেবল কবির স্বকীয় প্রতিভা। সেই প্রতিভা বলে বাণভট্ট যতদিন সংস্কৃত ভাষা জগতে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন অমর হইয়া গদ্য কবিকুলের চূড়ামণি রূপে অবস্থান করিবেন। * [সারস্বতপত্র ১২ই বৈশাখ ১২৯৯।

---

* পাশ্চাত্য মতানুয়ায়ী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌বিদ্বৎসমাজের এই মত যে কথাসরিৎসাগর কাদম্বরীর অনেক পরে সঙ্কলিত হইয়াছে। তবে যে কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পটি ও কাদম্বরী;

পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ।



ইদানীং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এবং গোয়ালন্দ ডাক-জাহাজ প্রভৃতির কল্যাণে আসাম প্রদেশে যাতায়াত অতিশয় সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে যখন মাত্র মাল জাহাজ ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া আসিত, তখনও আসাম আসা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুটা সুগম হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যখন জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে পর্ব্বতভেদী রাস্তা মাত্র গতায়াতের উপায় ছিল তখন আসামে ভিন্নস্থানের লোক আসিতে চাহিত না। যাহারা আসিত তাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আসিত; দেশে অনুপায় না হইলে কেহ এখানে আসিত না। একবার আসিলে পথক্লেশ স্মরণ করিয়া এবং স্বদেশের অসচ্ছলতা ইত্যাদি ভাবিয়া সহজে বড় কেহ ফিরিয়া যাইতে

কথার এত ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য, তাহার কারণ এই যে বৃহৎকথা অবশ্য কাদম্বরীর পূর্ব্বেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং সেই বৃহৎকথারই সংক্ষিপ্ত সার কথাসরিৎসাগর। যাহা হউক, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুত্যনুসারে, সরিৎসাগর, বৃহতের সংক্ষিপ্তসার হেতুতে পুত্র। পিতার অবর্ত্তমানে, পিতৃধনে পুত্রেরই অধিকার, এই স্মৃত্যনুসারে, বৃহৎকথা চিরবিলুপ্ত হওয়াতে কাদম্বরীকথোপাদানস্বমূলকঋণশোধনের অধিকারী কথাসরিৎসাগর কি না, এবং "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" এতৎ প্রবচনানুসারে, যে বৃহৎকথা বিনষ্ট হইয়া ভূতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কথা বারংবার উল্লেখ করতঃ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা বর্ব্বরত্ব মাত্র কি না, তাহা সুধীগণের বিভাব্য। বোধ হয় তন্নিমিত্তই প্রবন্ধকার বৃহৎকথার কথা না বলিয়া বারংবার কথাসরিৎসাগরের কথাই বলিয়াছেন। ইতি কস্যচিৎ কাদম্বরীপ্রসঙ্গপ্রমত্তস্য।

যাইত না এইখানেই বিবাহাদি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রবাদ হইয়াছিল, "আসামে আসিলে ভেড়া বনিয়া যায়।"

যখন অবস্থা এই ছিল, তখন ভাল লোক আসামে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া যে আসামের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবে তাহার সম্ভাবনাও কম ছিল। সুতরাং আসামের ইতিহাস কেহ বড় জানিত না। না জানাটা বড় একটা যে ক্ষতির বিষয় ইহাও কেহ মনে করিত না। ফল কথা আসাম ও ইহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে বঙ্গদেশে একটা ঔদাস্য-অবহেলার ভাবই পরিলক্ষিত হইত।

তখন মা কামাখ্যাই আসামকে বহির্জগতের সঙ্গে কিছুটা জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালীজাতি চিরকালই তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত বিখ্যাত। গয়া, কাশী, হরিদ্বার বৃন্দাবন বা শ্রীক্ষেত্র যে স্থানেই যাও না কেন, যাত্রিকের ভূরিভাগ বাঙ্গালী দেখিতে পাইবে। কামাখ্যা দর্শনের নিমিত্ত সুতরাং বাঙ্গালাদেশীয় নর-নারী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কামরূপে আসিত। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মার্থে আসিত, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ প্রাচীন তত্ত্বের অনুসন্ধানলোলুপ লোক দেখা যাইত। কামাখ্যার মন্দির কে কখন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, কামাখ্যার সেবাপূজার বিধিব্যবস্থা কে করিয়া দিয়াছেন, ইহারও কেহ খবর লইত কিনা সন্দেহ, কামাখ্যা মহাপীঠের আবিষ্কার কিরূপে হইল, তাহা ত দূরের কথা।

বঙ্গদেশের জনগণমধ্যে বোধ হয় সাধকপ্রবর মহাত্মা পূর্ণানন্দ গিরিই সর্ব্ব প্রথম কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিতে আসেন;

অথবা বোধ হয় তিনিই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গীয় জনসমাজে এই মহাপীঠের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাই সাধারণ লোকের মধ্যে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে পূর্ণানন্দ গিরিই এই মহাপীঠের আবিষ্কর্ত্তা এবং সেই ধারণা আজিও কোন কোন স্থানে অব্যাহত রহিয়াছে।

মহাত্মা পূর্ণানন্দ বঙ্গদেশের গৌরবাস্পদ। তিনি কামাখ্যা পীঠের আবিষ্কারক এই ধারণাই যে তাঁহাকে গৌরবের আসনে বসাইয়াছে তাহা নহে। তিনি শক্তিসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার উর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। "পূর্ণানন্দ বংশীয়" বলিয়া আজিও তদীয় বংশধরগণ স্বীয় সমাজে আপামর সাধারণের নিকট অশেষ সম্মান লাভ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম শাক্ত হিন্দুসমাজে আবহমান কাল কৃতজ্ঞতা ও সম্মান সহকারে স্মৃত হইবে। ফলকথা, তিনি কামাখ্যা পীঠের আবিষ্কারক নহেন, ইহা প্রচারিত হইলে তাঁহার গৌরব-মাহাত্ম্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

বহুদিন হইল "আরতি" পত্রিকায় * "পূর্ণানন্দ পরমহংস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহঁার লেখক মহাশয়ও সাধারণ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কামাখ্যা পীঠের উদ্ধারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে উক্ত

* আরতি, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৯।

প্রবন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক এই ধারণার মূলে যে যাথার্থ্য নাই, ইহা, এবং মহাপীঠের আবিষ্কার সম্বন্ধে আসাম প্রদেশের ইতিহাসে কি কি কথা বর্ণিত আছে তাহা, এবঞ্চ পীঠ-সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য অপর দুই একটি বিষয় বলিবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কোচবিহার রাজ্যের অধিপতিগণ শিববংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে কোচ-রমণীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে বিশু ও শিশু নামে দুইটি বালক জন্মে। ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বাহুবলে জন্মস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়া "বিশ্বসিংহ" ও "শিবসিংহ" এই নাম ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ রাজ্যের বিস্তার করিতে করিতে সমগ্র কামরূপ প্রদেশের অধীশ্বর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে কামরূপ করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কালক্রমে পূর্ব্বাংশ হইতে পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বসিংহের বংশধরগণের রাজত্ব কোচবিহারে সীমাবদ্ধ হইয়া যায় এবং কামরূপ'ও বর্ত্তমান সংকুচিতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাদেবের ঔরসজাত কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ এই বিশ্বসিংহ মহারাজই কামাখ্যা মহাপীঠ আবিষ্কার করেন। এই বিষয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কৃত "আসাম বুরঞ্জি" (ইতিহাস) গ্রন্থে † আসামীয় ভাষায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য পালন করিতে

† ৫৫—৫৬ পৃষ্ঠা (৪র্থ সংস্করণ)।

লাগিলেন। কমতাপুর নগর লওয়াতে এবং অন্যান্য মেছ ও কোচজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করাতে তাঁহার অনেক শত্রু হইল। সেইগুলিকে ক্রমশঃ দমন করিয়া রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই উজাইয়া গৌহাটির দিকে আসিলেন। এক দিন দুই ভাই নীলাচল পর্ব্বতে গেলেন। সম্প্রতি যেমন এই পর্ব্বত বহুজনাকীর্ণ স্থান হইয়াছে, তখন তেমনটি ছিল না। অতি সামান্য মেছ বা কোচকুলের কয়েক জন মানুষ মাত্র সেখানে ছিল। বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ দুই ভ্রাতা সঙ্গের লোকজন হারাইয়া সেই মেছ বসতিতে গিয়া কোনও পুরুষ মানুষের সাক্ষাৎ পাইলেন না। কেবল একজন বৃদ্ধার দেখা পাইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি একটা বট গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। সেই স্থলে একটা মাটির ঢিবি ছিল। অতিশয় পিপাসাতে রাজা ঐ বৃদ্ধার কাছে হইতে শুশ্রূষা পাইলেন। গাছের নীচের মাটির ঢিবি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে, বৃদ্ধা উহা তাহাদের দেবতা বলিয়া কহিল। রাজা সঙ্গীয় লোকজন সত্বর পাইবার জন্য সেই স্থলে প্রার্থনা করার অল্প পরেই উহারা আসিয়া সকলেই উপস্থিত হইল। এই প্রকারে সেই দেবতার মাহাত্ম্য জানিয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, উহাতে পূজা করিতে হইলে শূকর ও কুক্কুট কাটিয়া বলি দিতে হয় এবং উপচাররূপে স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কার দিতে হয় শুনিয়া, উহা শক্তি-পীঠ বা শক্তির স্থান জ্ঞানে তিনি এই সংকল্প করিলেন যে যদি তাঁহার দেশ সুস্থির হয় এবং রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় তাহা হইলে সোণার মন্দির

নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। রাজা আপন দেশে ফিরিয়া আসার পর ক্রমশঃ দেশ সুস্থির হইল। তিনি সমস্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া আনিয়া সেই দেবতা স্থানের বিষয় অনুসন্ধান করাতে উহা কামাখ্যার পীঠস্থান বলিয়া জানিলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত, রাজা সেই গাছটি কাটাতে তাহার নিম্নে কামাখ্যার পীঠ বাহির হইল। এইরূপে যোগিনীতন্ত্র এবং অন্যান্য পুরাণ দেখিয়া রাজা তত্রস্থিত প্রায় সকল পীঠই বাহির করিলেন। কামাখ্যা মন্দিরের তলের ভাগটাও মাটির নীচ হইতে বাহির হইল। রাজা সেই তলের খণ্ডের উপরেই মন্দির করিয়া দিলেন এবং সোণার মন্দিরের পরিবর্ত্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে একরতি করিয়া সোণা দিলেন।"

এই বৃদ্ধাটি কে তাহা বুরঞ্জিতে উক্ত হয় নাই। বুঝি বা জগন্মাতা, সদাশিবের ঔরসজাত পুণ্যশ্লোক মহারাজ বিশ্বসিংহই তদীয় মহাপীঠের আবিষ্কারক হইবার যোগ্যপাত্র মনে করিয়া, করুণা করিয়া স্বয়ং এই জরতীবেশে আপন পীঠের প্রকটনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বুরঞ্জিতে সমস্ত পণ্ডিত আহ্বানের বিষয় উল্লেখ আছে। এই পণ্ডিতমণ্ডলীতে কি পূর্ণানন্দ ছিলেন? ইহাও অসম্ভব। মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৪৫০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগামী হন। ইহা বুরঞ্জিলেখক গুণাভিরাম বাহাদুরের মত। কেহ কেহ এই ঘটনা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে হয় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * তর্কের

* এই বিষয়ের বিচার-বিতর্ক Mr. Gait's Koch Kings of Kamarupa

খাতিরে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর তারিখ ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দই ধরিয়া নিলাম। তাঁহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর বলিয়া কথিত আছে। তাহা হইলে ১৫৩৪ খৃঃ মৃত্যুর তারিখ ধরিলে সিংহাসনাধিরোহণ কাল ১৫০৯ খৃঃ হয়। বুরঞ্জির উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে রাজার নীলাচল গমন ব্যাপার হইতে পণ্ডিতআহ্বান করিয়া পীঠস্থান নিরূপণ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশেই হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক ঐ পণ্ডিতআহ্বান কার্য্য তদীয় রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল ধরিলে ও উহার তারিখ ১৫২০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিলে বোধ করি কোনও রূপ অসঙ্গতি হইবে না।

তখন পূর্ণানন্দ কি করিতেছিলেন, দেখা যাউক। আরতির উল্লেখিত প্রবন্ধে দেখিতেছি যে শকাব্দা ১৪৪৮ সালের চৈত্র মাসে অর্থাৎ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দ জগদানন্দ শর্ম্মা রূপে বিষ্ণুপুরাণের এক প্রতিলিপি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার তখন পাঠ্যাবস্থা মাত্র। তবে পূর্ণানন্দ কোন সালে কামাখ্যা আসিয়া ছিলেন, তাহার একটা আনুমানিক সময় নির্দ্ধারণ করা যাউক। পূর্ণানন্দ যখন বিষ্ণুপুরাণ নকল করেন (১৫২৭) তাহার কিছুকাল পরে কালীবিদ্যা বিষয়ে সাধনা আরম্ভ করেন; তৎপর তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বীয় গুরু ব্রহ্মানন্দের উত্তরসাধকতা করেন। ব্রহ্মানন্দ সাধনাবস্থায় শবসহ অন্তর্হিত

নামক প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, Part I, No. 4, 1893.

হইয়া মণিপুরে গিয়া এক চণ্ডাল রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পূর্ণানন্দ সুদীর্ঘকাল দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক অনুসন্ধানের পর তাহাকে মণিপুরে তদবস্থায় প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহাকে প্রতিবোধিত করিয়া গুরুশিষ্যে মিলিয়া কামাখ্যা পীঠে আসিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করেন। উপরি উল্লেখিত প্রবন্ধে পূর্ণানন্দের উক্তরূপ কাহিনী দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোন্ সালে কি করিয়াছেন এইরূপ কোনও সময় নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সিদ্ধাবস্থায় পূর্ণানন্দ যে সকল গ্রন্থ লিখেন তাহাদের ধারাবাহিক উল্লেখ কালে প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "শাক্তক্রমে"র নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। উহার প্রণয়নের তারিখ ১৪৯৩ (কালাঙ্ক বেদেন্দু) শকাব্দা বা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ। উহা অবশ্যই পূর্ণানন্দ গুরুর অন্বেষণ ব্যাপারাদি সমাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কামাখ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই এই গ্রন্থ রচিত হয়, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং এই প্রথম গ্রন্থ রচনার ৫ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যা পীঠে আসিয়াছিলেন বলিলে অন্যায় হয় না। তাহা হইলে উহা ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা, অর্থাৎ যখন তিনি জগদানন্দরূপে বিষ্ণুপুরাণ নকল করেন, তাহার প্রায় ৪০ বৎসর পরের ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। এই ৪০ বৎসর সময় এতগুলি কঠিন ও কালসাপেক্ষ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল মনে করা বোধ করি অন্যায় হইবে না। যাহা হউক, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে যদি পুর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যা ধামে

আসিয়া থাকেন তবে তাঁহারা কি দেখিয়া গিয়াছিলেন? রাজা বিশ্বসিংহ যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। তখন বিশ্ব-সিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ প্রদেশের সিংহাসনা-ধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভগ্নমন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হইয়া ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৭ শকাব্দে) এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। অদ্যাপি নরনারায়ণের কীর্ত্তিখ্যাপক একটী প্রস্তর-ফলক কামাখ্যা মন্দিরের দ্বারদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে মহারাজের ও তদীয় ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজের মূর্ত্তিযুগলও তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতেছে। ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ, এই নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাও বোধ হয় দেখিয়া গিয়াছিলেন।

তবে, এই আবিষ্কারের কথাটা রটিত হইল কেন? ইহার উত্তর এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই অনুমানতঃ প্রদত্ত হইয়াছে—কামাখ্যা মহাপীঠে সাধন ভজন পূর্ব্বক ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজে ঘোষণা সগুরু পূর্ণানন্দ কর্ত্তৃকই হইয়াছিল; তজ্জন্যই বোধ হয় এই প্রবাদ। ইহার একটি নজিরও আছে। এখন সকলেই জানেন কলম্বস্ সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্কার করেন। কিন্তু তথাপি আমেরিগো বেস্পুসি নামক অপর এক ব্যক্তির নামেই সেই মহাদেশের নামকরণ হইয়া গেল, অথচ এই ব্যক্তি কলম্বসের সাত বৎসর পরে আমেরিকার দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইবার কারণ এই ছিল

কামাখ্যামন্দির

যে তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহার বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন।

কোচবিহারাধিপতিগণের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে প্রথমাবস্থায় কামাখ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হইলেও ইদানীন্তন তাঁহাদের সঙ্গে দেবীর বড় একটা সম্পর্ক দেখা যায় না। এমন কি মহাপীঠে আসিয়া সেই বংশের কেহ দর্শনস্পর্শন কি পূজাদিও করিতে পারেন না। এই সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ আছে, গুণাভিরামকৃত আসামবুরঞ্জি * হইতে অনুবাদক্রমে তাহা উল্লেখিত হইল।

"কামাখ্যার পূজা চালাইবার জন্য এই রাজা (নরনারায়ণ) নিজ দেশ কোচবিহার হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেন্দুকলাই নামে পূজারি ব্রাহ্মণের কথা সকলেই জানেন। নীলাচলের পূর্ব্বদ্বারমুখে কেন্দুকলাই ঠাকুরের মস্তকহীন মূর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান আছে। এখনও নীলাচলে যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই ঠাকুরের বংশধর। এমন একটি কথা প্রচারিত হইয়া আছে যে কেন্দুকলাই ঠাকুর যখন সন্ধ্যাকালে দেবীর পূজা করিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন তখন দেবী আসিয়া নৃত্য করিতেন। নরনারায়ণ রাজা এই কথা জানিয়া দেবীকে চেতনাবতী দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ঠাকুরকে বলিলে, ঠাকুর রাজাকে এই উপদেশ দিলেন যে সন্ধ্যা আরতির সময় যখন তাঁহার ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইবে তখন

* ৬২—৬৩ পৃষ্ঠা (৪র্থ সংস্করণ)

রাজা নাটমন্দিরের গবাক্ষদ্বারের ছিদ্রদিয়া তাকাইলে দেবীর দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। একদিন কথিত সময়ে সেই ঘণ্টাবাদ্য হওয়ায় রাজা ঐ ছিদ্রদিয়া মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করাতে রাজার চক্ষুতে দেবীর চক্ষু পড়িল। দেবী তাহাতে লজ্জা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কেন্দুকলাই ঠাকুরের মস্তক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং রাজাকে এই অভিশাপ দিলেন যে তিনি কিম্বা তাঁহার বংশের কোন লোক দেবী দর্শন করা দূরে থাকুক, নীলাচলপর্ব্বতের দিকে তাকাইতেও পারিবে না, চাহিলে মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন হইতে দেবী পূজার সময় প্রকটিত হওয়া ছাড়িলেন এবং শিববংশী কোচবিহার, বিজনী, দরঙ্গ বেলতলা প্রভৃতির রাজারা কি তাঁহাদের পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি নীলাচলের দিকে পার্য্যমাণ দৃষ্টিপাত করেন না।" *

এই অবস্থায় কোচবিহারাধীশ্বর ভূপ বাহাদুরগণ যে কামাখ্যা মাতার সেবাপূজা বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন

* রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি গল্পটি লিখিয়া তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা যে ভাবে করিয়াছেন, উহা পাঠকের কৌতুকাবহ হইবে বলিয়া তাহারও অনুবাদ দেওয়া হইল:—

"ইহা যে মোটেই প্রত্যয়ের অযোগ্য ইহা কে না বলিবে? রাজাকে দেবী দেখাইতে না পারিয়া কেন্দুকলাই ঠাকুর লজ্জা পাইয়া অকস্মাৎ পড়িয়া গেলেন; এবং অপস্মার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকাতে রাজা ঠাকুরকে দেখিতে গেলে ঠাকুর অনেকক্ষণে চৈতন্য লাভ করিয়া, দেবীদর্শনের এই ফল বলিয়া রাজাকে দেবীদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন। সেই হইতে রাজা ও রাজার পরিবারস্থ লোকে ঐরূপ বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া নীলাচলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, ছত্রদ্বারা আড়াল করিয়া যান।" কি চমৎকার ব্যাখ্যা!!

ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ কালক্রমে কামাখ্যাধাম তাঁহাদের রাজ্যের সীমার বহির্ভূত হইয়া পড়িল। আসামের অধিপতি আহোম্ জাতীয় ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবগণ কর্ত্তৃক এই স্থান অধিকৃত হইল। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গদেব গদাধরসিংহ, রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহের সময়ে রাজপরিবারে শাক্তধর্ম্মের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে গদাধরসিংহ রাজা হইবার পূর্ব্বে তাৎকালিক আহোমরাজ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয়ে যখন ছদ্মবেশে অরণ্যে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একদা রাজসৈন্যদ্বারা অনুদ্রুত হইয়া আর্ত্তস্বরে "মা আমায় রক্ষা কর" বলিয়া আহ্বান করাতে সন্নিকটস্থ একটা প্রকাণ্ড শিলা হঠাৎ ফাটিয়া যায়, এবং তিনি উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করেন। আরও প্রবাদ আছে যে একদিন আহোম রাজার চরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গদাধর সিংহ যখন ধৃতপ্রায় হন, তখন পার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে সহসা একটি শ্যামাঙ্গী স্ত্রীমুর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া ঐ বৃক্ষের একটা শাখা নোয়াইয়া ধরেন এবং গদাধরকে তদবলম্বনে বৃক্ষের উপর তুলিয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় গদাধরসিংহ সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া শাক্ত ধর্ম্মের প্রতি যে বিশেষ ভাবে অনুরাগী হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনিই আহোম রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেবালয় নির্ম্মাণে এবং দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রদানে মুক্তহস্ত হন। উমানন্দের মন্দির ইঁহারই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই স্বর্গদেবের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পুত্র রুদ্রসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন রাজা আহোম বংশে অল্পই দেখা গিয়াছে।* রুদ্রসিংহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নদীয়া-শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম নামক একজন সাধক মহাপুরুষকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। কথিত আছে জলে নামিয়া স্নান আহ্নিক করিবার সময়ে এক শিঙ্গীমাছ কাঁটা ফুটাইয়া তাঁহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত করাতে ব্রাহ্মণের মন্যুপ্রভাবে জলাশয়স্থ সমস্ত শিঙ্গী মরিয়া ভাসিয়া উঠে; তদবধি উহাকে লোকে "শিঙ্গীমারা ভট্টাচার্য্য" বলিত। যাহা হউক দৈবগতিকে রুদ্রসিংহের কৃষ্ণরাম হইতে দীক্ষা-গ্রহণ ঘটিয়া উঠে নাই, তিনি তৎপূর্ব্বেই স্বর্গগামী হইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহও অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ এবং দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তৎপুত্র শিবসিংহ সিংহাসনস্থ হইয়াই কৃষ্ণরাম হইতে দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই স্বর্গদেব ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন; এমনও প্রবাদ আছে যে তিনি ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার

* ইঁহার পিতা গদাধর সিংহ যেমন দেবীর অনুগৃহীত ছিলেন, ইঁহার জননী জয়মতী তেমনি দেবীস্বরূপা ছিলেন। যখন স্বামী গদাধর ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন আহোমরাজ জয়মতীর নিকট হইতে গদাধর কোথায় আছেন এই সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। সাধ্বী জয়মতী স্বামীর খবর জানিয়াও তাহা প্রকাশ করেন নাই, মাসার্দ্ধকাল ব্যাপী ভীষণ অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রুদ্রসিংহ পুণ্যশ্লোকা মাতৃদেবীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শিবসাগরে "জয়সাগর" নামে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।

লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি গুরুদেব কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌমকে প্রভূত ব্রহ্মত্রবৃত্তি দিয়া নীলাচলে স্থাপিত করেন। কৃষ্ণরামের পর্ব্বতে অধিষ্ঠান হেতু তিনি এবং তদীয় বংশধরগণ "পর্ব্বতীয়া গোসাঁই" নামে খ্যাতি লাভ করেন। কামাখ্যাতে এবং কামরূপস্থ অন্যান্য দেবালয়ে অদ্য পর্য্যন্ত যেরূপ পূজাবিধি প্রচলিত আছে, এই কৃষ্ণরাম কর্ত্তৃকই তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এবং স্বকীয় স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বর্গদেব শিবসিংহ কামরূপ প্রদেশের বহুস্থানে দেবালয় নির্ম্মাণ এবং দেবত্র ব্রহ্মত্র বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ও চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আসামে যত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশেই এই ধার্ম্মিক মহারাজের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীতও অন্যান্য আহোমরাজ কামরূপস্থিত দেবতা এবং ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ ও পরিপোষণ নিমিত্ত অল্প-বিস্তর বিত্ত-বিষয় সম্প্রদান করিয়া গিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের উল্লেখ করা হইল না। ফল কথা কামাখ্যা মহাপীঠ কোচবিহারাধিপতিগণের দ্বারা প্রথমতঃ আবিষ্কৃত এবং সেবিত হইলেও, অবশেষে ইঁহারা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে আহোমবংশীয় রাজগণই ক্রমশঃ এই পীঠের সেবা-পূজার ভার গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমানে কামাখ্যা মহা-পীঠে, অথবা দেবতাক্ষেত্র কামরূপের নানাস্থানে সংস্থিত অন্যান্য দেবালয়ে সেবাপূজার যে বন্দোবস্ত বা বিধিবিধান দেখা যায়, তাহাও এই আহোমবংশীয় স্বর্গদেবগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আরতি, বৈশাখ ১৩১৪

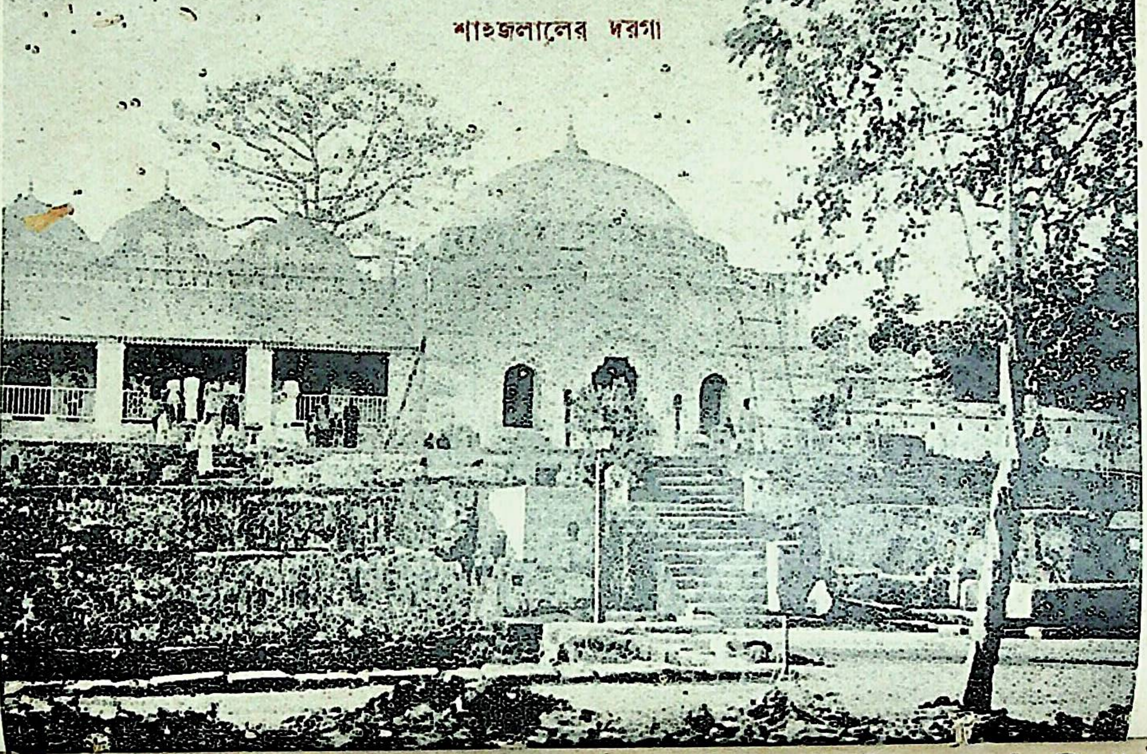
ফকির শাহ জলাল।

(১) সময় নিরূপণ

কি হিন্দু কি মোসলমান কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী যে কোনও ব্যক্তিই শ্রীহট্টে নূতনকল্পে আসুন না কেন, তাঁহাকে একবার শাহ জলালের দরগায় যাইতে হয়। মোসলমান যান, সুপ্রসিদ্ধ ফকির শাহ জলালের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে জিয়ারত করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত। হিন্দু যান, শ্রীহট্টের প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধতম মস্‌জিদ্ * নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত; বিশেষতঃ যে কোনও ধর্ম্মেরই আরাধ্য দেবতার অথবা সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হিন্দুর রীতি; মহাত্মা শাহ জলালের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তও সুতরাং অনেকে গিয়া থাকেন। ইংরেজ প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ এই মস্‌জিদ দেখিবার জন্য এবং দরগা ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য গিয়া থাকেন। যখন ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রবর্ত্তন, তখন যাঁহারা এই জিলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন তাঁহা-দিগকে এই দরগায় গিয়া অভিষিক্ত হইতে হইত। ১৭৭৬

* "The principal mosque in the district is that known as Shah Jalal's Darga in the Sylhet town." Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. ii., page 283.





শাহজালালের দরগা

সালে মিঃ লিণ্ডসে নামক একজন সাহেব শ্রীহট্টে রেসিডেণ্ট (কালেক্টর) হইয়া আইসেন; তিনি স্বীয় অভিষেক ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

I was now told that it was cutomary for the new resident to pay his respects to the tutelar saint Shah Jalal. Pilgrims of the Islam faith flock to this shrine from every part of India and I afterwards found that the fanatics attending the tomb were not a little dangerous. It was not my business to combat religious prejudices and I therefore went in state as others had done before me. I left my shoes on the thresh-hold and deposited on the tomb 5 gold mohars as an offering. Being thus purified I returned to my dwelling place and received the homage of my subjects.

কথিত আছে যে সমাধিক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে সাহেবেরা দরগার পুষ্করিণীতে নিয়ম মত স্নান করিয়া যাইতেন।

শাহ জলালের দরগার চিত্রময় প্রতিরূপ পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা হইল।* কিন্তু সেইস্থানে না গেলে উহার

* মস্‌জিদের উত্তর দিকে যে বৃক্ষরাজি দেখা যায় ইহারই অন্তরালে মহাত্মা শাহ জলালের ইষ্টকময় কবর বর্ত্তমান। চারিটি স্তম্ভে সংবদ্ধ এক চন্দ্রাতপ মাত্র দ্বারা এই কবর আচ্ছাদিত ; উন্মুক্ত আকাশের আবরক এখানে আর কিছুই নাই।

চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কখনই অনুভূত হইতে পারে না। শ্রীহট্টভূমি প্রকৃতিদেবীর লীলানিকেতন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ তন্মধ্যে যে স্থানে এই দরগা অবস্থিত সেই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় সুতরাং অবর্ণনীয়। নিতান্ত চিন্তাভারে প্রপীড়িত কিম্বা দুঃখযন্ত্রণায় অবসন্ন হৃদয় লইয়াও যদি ঐ পরম রমণীয় স্থানে গমন করা যায়, তবে স্থানমাহাত্ম্যেই যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয় হইতে সমস্ত ভার অপসৃত হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে শান্তিরস আসিয়া মনঃপ্রাণ অধিকার করে।

ফকির শাহ জলাল দ্বারা শ্রীহট্টভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছে। মোসলমানগণ মহাপুরুষদিগের সমাধিক্ষেত্রে আসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের মদিনাস্থিত পবিত্র সমাধিস্থল অবশ্যই সর্ব্বোপরি বরণীয়। তৎপর বাগ্‌দাদ নগরীস্থ বড় পীর শাহ আব্দুল কাদের জিলানীর সমাধি ভূমি, আজমীরের খাজেমৈন উদ্দীন চিষ্‌তির কবর স্থান এবং শ্রীহট্টস্থ ফকির শাহ জলাল মজঃরদের † সমাধিক্ষেত্র পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র মোসলমান সমাজের নিকট শ্রীহট্ট তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ‡

† তাৎকালিক মোসলমান জগতে অনেক শাহ জলাল ছিলেন তন্মধ্যে এই মহাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য শাহ জলাল হইতে বিশিষ্ট করিবার জন্য ইঁহাকে "মজঃরদ" অর্থাৎ চিরকুমার উপাধি দেওয়া হয়। এই মহাপুরুষ জীবনে কখনও নারীমুখ সন্দর্শন করেন নাই।

‡ দিল্লীর শেষ সম্রাট মোহাম্মদ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ ফকির শাহ জলালের সমাধিস্থান দর্শনার্থ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন।

ঈদৃশ মহাত্মার পবিত্র কাহিনী জানিতে কাহার না অভিলাষ হয়? এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত কিরূপ আলোচনা হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহাই বলা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন *:—

"The prince (Raja Gaur Gobinda *alias* Gobinda Sinha) was overthrown by Shah Jalal *alias* Jalaluddin Khany, who following the footsteps of his predecessor Maluk Yazbeg led his army to the eastern parts of Bengal, invaded Sylhet in 1257 A. D., and brought some of the petty independent Rajas under his control. His success however was short-lived, for he was suddenly called back to defend Gaur from the invasion of Irsilan Khan and soon after killed in battle."

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি সর্ব্বসাধারণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি আছে জানি। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for August, 1880.

[আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল দক্ষিণ শ্রীহট্টে ভাটেরা নামক স্থানে দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার পাঠ উদ্ধার করেন। একটি শাসনে "গোবিন্দ" এই নাম দেখিয়া ডাঃ

করিলে তদীয় গবেষণার গভীরতা বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ আসে এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের হ্রাসতা জন্মে। তিনি শুনিয়া-ছিলেন শাহ জলাল শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাভূত করেন। এখন এই শাহ জলাল কে, তাহা বাহির করিতে হইবে। একটা রাজাকে যখন পরাস্ত করিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই একজন বীরপুরুষ হইবেন। বঙ্গীয় ইতিহাসের পত্রো-দ্ঘাটন করিয়া "জালাল উদ্দিন খানি" নামক এক দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত দেখা গেল। যখন শাহ জলালেও "জলাল" আছে এবং জালাল উদ্দীনেও "জলাল" আছে তখন দুই এক না হইয়া যায় না। অতএব স্থির হইল ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহ জলাল ওরফে জলাল উদ্দীন খানি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূমিপতিকে পরাভূত করেন কিন্তু হঠাৎ ইরসিলান খাঁর আক্রমণ হইতে গৌড় ভূমি রক্ষা করিতে গিয়া সেখানেই যুদ্ধে নিহত হন।

ডাক্তার মিত্র যদি অনুগ্রহ করিয়া তাম্রশাসন প্রেরয়িতা শ্রীহট্টের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত লটমেন জনসন সাহেবকেই শাহ জলাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিতেন তবে জানিতে পারিতেন যে, শাহ জলাল শান্ত দান্ত ফকির ছিলেন, নরশোণিতপিপাসু কোনও দুর্দ্দান্ত বীরপুরুষ ছিলেন না এবং তাঁহার সমাধিক্ষেত্র শ্রীহট্ট সহরেই বিরাজমান ; অতএব গৌড় ভূমিতে গিয়া যুদ্ধে নিহত হইবার কথা তৎসম্বন্ধে

মিত্র উহাকেই শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দ বলিয়া মনে করেন এবং তদুপলক্ষে এতদ্দ্বৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।]

অসম্ভাবিত। তিনি তদীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শাহ জলালের যে তারিখ (১২৫৭ খৃঃ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।*

ডাক্তার W. W. Hunter সঙ্কলিত Statistical Accounts of Assam Vol. ii গ্রন্থে, History and Statistics of the Dacca Division—Sylhet section, ২৯১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"Sylhet appears to have been conquered by a small band of Mohammadans in the reign of the Bengal king Shamsuddin (1384 A. D.). The supernatural powers of the last Hindu king Gaur Govinda proved ineffectual against the

* ভাটেরার তাম্রশাসনের উপর টিপ্পনী করিতে গিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে কেবল এই ভুল টুকুই করিয়াছেন তাহা নহে। তাম্রশাসনে গোবিন্দকেশব এই নামধারী নৃপতির উল্লেখ দেখিয়া উহাকেই শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দ ওরফে গোবিন্দ সিংহ কল্পনা করিয়াছেন। গৌড় গোবিন্দ (বা গৌর গোবিন্দ বা গুরুগোবিন্দ বা গরুড় গোবিন্দ) যে কে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মধ্য ভারতের ভোজ বা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একাধিক রাজার এই নাম ছিল কি না তাহাও এক সমস্যার বিষয়। যাহা হউক এই বিষয়ে সম্প্রতি বাগ্‌বিতণ্ডা অনাবশ্যক। ডাঃ মিত্র তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমি পরিমাণে 'হল' শব্দের ব্যবহার দেখিয়া ইহা কি তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত সুবহু পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ পংক্তিনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া কোনও মীমাংসায় পৌছিতে পারেন নাই। অথচ শ্রীহট্টের যে কোনও নগ্নপাদ হালিককে জিজ্ঞাসা করিলেও হালের পরিমাণ কত তাহা বলিয়া দিতে পারিত।

[এক হাল—৬৫৮৫৬ বর্গহস্ত]

still more extraordinary powers of the Fakir Shah Jalal who was the real leader of the invaders although he subsequently made over the active management of the secular affairs to the nominal leader Sikandar Ghazi."

সংক্ষেপে এই স্থানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা শাহ জলালের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে। তবে তারিখ (১৩৮৪ খৃঃ) যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয় পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

মহাত্মা শাহ জলালের দরগার তত্ত্বাবধান নিমিত্ত বহুকাল হইতেই খাদিম নিযুক্ত আছেন।* তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাহ জলালের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নসির উদ্দিন হায়দার নামক জনৈক মোন্‌সেফ শ্রীহট্টে আসিয়া সাধু শাহ জলালের পরম ভক্ত হন এবং পূর্ব্বতন বিবরণীর সহায়তায় "সুহেলি এমন্" † নাম দিয়া পারস্য ভাষায় এই মহা পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান। এই গ্রন্থের অনুবাদ স্বরূপ "তোয়ারিখে জলালি" নামধেয় একখানি মোসলমানী কেতাব আছে। কিন্তু উভয় গ্রন্থই শিক্ষিত

* খাদিমগণের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার উপাধি সরকুম। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৯৩/৬ বৃত্তি পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সরকুম মৌলবী আবুল হাফেজ সাহেব একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার নিকট হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ বিষয়ে অনেক সহায়তা পাওয়া গিয়াছে।

† শাহ জলালের জন্মভূমি আরবের (Yemen) এমন প্রদেশ; সুহেলি এমন অর্থে এমনের নক্ষত্র।

সাধারণের নিকট অপরিচিত নতুবা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এইরূপ প্রকাণ্ড ভ্রম ঘটিত না এবং ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্টেও শাহ জলাল বিষয়ে এইরূপ অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র থাকিত না। তাই সুহেলি এমন অবলম্বনে ফকির শাহ জলাল সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিবার নিমিত্ত সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কিন্তু সুহেলি এমনে শাহ জলালের শ্রীহট্ট আগমনের তারিখ হিজরীর ৫৬১ সন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ৫৬১ হিজরীতে খৃষ্টাব্দ ১১৬৫ হয়। এই তারিখ বিখ্যাত স্থানেশ্বরের যুদ্ধের প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। তখনও দিল্লী মোসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় নাই এবং সুদূর বঙ্গে মোসলমানের নামও শ্রুত হয় নাই। এতদবস্থায় ঐ তারিখ নিতান্তই অশুদ্ধ। সুহেলি এমনে এমন ভ্রম প্রমাদ আরও যে না আছে সে কথা বলিতে পারি না। তবে শাহ জলালের শ্রীহট্টে আগমনের তারিখ কিরূপে নির্ণীত হইবে ?

সুহেলি এমনের মতে যখন শাহ জলাল স্বীয় জন্মভূমি হইতে দিল্লীতে আইসেন তখন দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দীন অবস্থিত ছিলেন এবং দিল্লীতে ফকির নেজাম উদ্দীন নামে এক আউলিয়া বাস করিতেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। নেজাম উদ্দীনের শিষ্য প্রসিদ্ধ পারস্যকবি আমীর খসরু তাঁহার গুরুর উপদেশমালা সঙ্কলন কালে লিখিয়াছেন যে নেজাম উদ্দীন ৭২৫ হিজরীতে অর্থাৎ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাদ্বারা শাহ জলালের

ভারতবর্ষে তথা শ্রীহট্টে আগমন সময় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম কি দ্বিতীয় দশাব্দী (Decade) হইবে বলিয়া নির্দ্দেশিত করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ সঙ্কলিত রাজমালায় আছে ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ মুর ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা পীর শাহ জলালকে শ্রীহট্টে দর্শন করেন। ইহাতে বোধ হয় মহাত্মা শাহ জলাল বহুকাল, অন্যূন ৪০ বৎসর, শ্রীহট্টে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুহেলি এমনে আছে যে শাহ জলাল ৬২ বৎসর বয়সে, শ্রীহট্টে আসিবার ৩০ বৎসর পরে, ৫৯১ হিজরীতে. জেকাদার চাঁদের ২০শে তারিখ, দেহত্যাগ করেন। বড়ই দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় যে সুহেলি এমনের লিখিত এই সন-তারিখ বয়ঃক্রম, অবস্থান কাল সমস্তই অবিশ্বাস করিতে হইল। যদি শাহ জলাল আলাউদ্দীনের মৃত্যুর বৎসরেও (১৩১৬ খৃঃ অব্দে) শ্রীহট্টে পৌঁছিয়া থাকেন তথাপি ৩০ বৎসরে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দ মাত্র হয়। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক ইবনে বতুতার সঙ্গে শ্রীহট্টে সাক্ষাৎকার সুতরাং অসম্ভব ব্যাপার অথচ ঐ পর্য্যটক অনৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন একথা বলাও গর্হিত। অতএব কাল নির্ণয় বিষয়ে সুহেলি এমনের কথা সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জনীয়।

মহামতি হাণ্টার সাহেবের উদ্ধৃত ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দের বিরুদ্ধে ইবনে বতুতাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হাণ্টার সাহেবের উদ্ধৃতাংশে বঙ্গীয় নরপতি শামসুদ্দীনের যে উল্লেখ আছে তাহার কারণ বোধ হয় এই যে শাহ জলালের বিবরণের সঙ্গে জনৈক শামস-

উদ্দীনের নাম শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু মোসলমান রাজত্বের প্রথমাংশে বঙ্গের সিংহাসনে শামসউদ্দীন নামক একাধিক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৩-১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে যিনি বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন তাঁহার নাম সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস্ খাজে ছিল। ১৩৮৩-৮৫ খৃষ্টাব্দে যিনি বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন তিনিও শামস্উদ্দীন নামে অভিহিত ছিলেন। অপিচ শাহ জলালের কবরের গণ্ডীর ভিতরে যাইবার পথে তোরণ দ্বারের উপরিভাগে যে এক শিলাখণ্ড আছে তাহাতে উৎকীর্ণ লিপিমালায় অপর এক বঙ্গাধিপ সোলতান শামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহের নাম আছে;* উঁহার রাজত্ব কাল ১৪৭৪-১৪৮১ খৃষ্টাব্দ। হাণ্টার সাহেব ধৃত বিবরণীতে দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনকেই ফকির শাহ জলালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে, এবং ১৩৮৪ খৃঃ এই তারিখও ঐ ধারণা বশতঃই নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত শামস্ উদ্দীন (ইলিয়াসখাজে) শাহ জলালের শ্রীহট্টে আগমনের

* In Darga of Shah Jalal at Sylhet an ancient basalt stone bearing an inscription of the Bengal Sultan Shamsuddin Yusuf Shah (1474—1481 A. D.) is at present used as a lintel over the small door leading to the enclosure where the saint lies buried. As both the beginning and the end of the inscription are hidden under the masonry of the wall it has been impossible to read the whole inscription. The inscription is of some interest as it proves that Sylhet was a part of the independent Muhammadan King-dom of Bengal in the last quarter of the 15th century. (Extracts from letter No. 63 dated the 27th July 1903 from Dr. T. Bloch Archaeological Surveyor, Bengal Circle, to the Secretary to the Chief Commissioner of Assam.)

না হউক অবস্থানের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেই কোন গোল ঘটে না—ইবনে বতুতার সঙ্গেও মিল হয়। শেষোক্ত শামসউদ্দীন (ইউসুফ শাহ) ফকির শাহ জলালের প্রতি ভক্তি-মান্ ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সমকালীন ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফল কথা শাহ জলাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে শ্রীহট্টে আগমন করেন এবং এখানে উক্ত শতাব্দীর অন্ততঃ ৬ষ্ঠ দশাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই মহাত্মার অলৌকিক জীবনকাহিনী আলোচিত হইবে।

[প্রদীপ—কার্ত্তিক ১৩১১।

ফকির শাহজলাল।

(২) জীবনকাহিনী।

[জন্মস্থান]—পুণ্যভূমি আরবের হেজাজ পবিত্রতম স্থান। ঐ স্থানে গিয়া মক্কা মদিনা প্রভৃতি মহাপুরুষ মোহাম্মদের লীলা ভূমি সন্দর্শনপূর্ব্বক হজব্রত উদযাপন করিয়া 'হাজি' নামে পরিচিত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমান মাত্রেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সেই হেজাজক্ষেত্রের সংলগ্ন ভূভাগই এমন এবং উহাই ফকির শাহ জলালের জন্মভূমি।

[জন্মসময়]—পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাহজলাল জন্ম পরিগ্রহ করেন।

[পিতামাতা]—হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন সেই কুরেষি বংশীয় এব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ শাহ জলালের জনক ছিলেন। জননী সৈয়দ বংশীয়া ও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শাহ জলালের ৩ মাস বয়ঃক্রম কালে মাতা স্বর্গগামিনী হন, পিতা মাহমুদও কাফেরের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়া অচিরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

[ধর্ম্ম গুরু]—এই অনাথ শিশুর প্রতিপালন ভার, তদীয় মাতুল * সৈয়দ আহমদ কবীর নামক মহাত্মা গ্রহণ করিলেন।

* একখানি হস্তলিখিত পুস্তকের মত অনুসরণ পূর্ব্বক প্রদীপের প্রবন্ধে "মাতৃস্বসৃপতি" লিখা হইয়াছিল।

তিনিই আবার শাহজলালের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গুরুতর ভার গ্রহণকরিয়া তদীয় দীক্ষাগুরুর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। গুরু পরম্পরায় শাহজলাল মোসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় ছিলেন। *

---

* মোহাম্মদ
|
আলী
|
হাসন বসরী
|
হবীব আজমী
|
শেখ দায়ুদ তায়ী
|
শেখ মারুফ্ কয়খী
|
শেখ সরিসপ্তী
|
মমসাদ দিনুরী
|
শেখ মোহাম্মদ
|
শেখ আহমদ দিনুরী
|
সেখ ওজিউদ্দীন
|
আবু নসর জিয়াউদ্দীন
|
মোকদ্দম বাহাউদ্দীন
|
আবুল ফজল সদর উদ্দীন
|
রুকুন উদ্দীন আবুফতাহ্
|
সৈয়দ জলাল উদ্দীন বোখারী
|
সৈয়দ আহমদ কবীর
|
শাহ জলাল মজঃরদ

[মৃগকাহিনী]—পবিত্র মক্কাধাম সৈয়দ আহমদ কবীরের বাসস্থান বা সাধনা স্থান ছিল। শিষ্য ও ভাগিনেয় শাহ জলালও তৎসঙ্গেই অবস্থান করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতেছিলেন। একদা এক হরিণ সহসা সৈয়দের কুটীরদ্বারে আসিয়া তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আপন ভাষায় তাহার দুঃখ কাহিনী কহিতে লাগিল; তির্য্যগ্ ভাষাবিৎ মহাত্মা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মৃগের অভিযোগ এই যে সে তৃণপর্ণাহারী নিরপরাধ জীব,—এক দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার সুখ, শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, তাহার যন্ত্রণায় বনে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দয়াবান্ সাধুরা বনচর পশু পক্ষীর প্রতিও করুণা পরবশ। তাই পীর আহমদ শিষ্য শাহ জলালকে আদেশ করিলেন, "বৎস, সেই অত্যাচারী শার্দ্দূলকে যথোচিত শাস্তি প্রদানপূর্ব্বক বন হইতে তাড়াইয়া দিবে, এবং যাহাতে এই নিরীহ হরিণ স্বচ্ছন্দে আপন আবাসে তিষ্ঠিতে পারে তাহার বিধান করিয়া আসিবে।" গুরুর আদেশে শাহজলাল এই দুষ্কর কার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু সাধু মহাত্মগণ যেমন স্বয়ং জীবহিংসাপরাঙ্মুখ, সেইরূপ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণও তাঁহাদিগকে কদাপি আক্রমণ করে না। শাহজলাল বনে গিয়া ব্যাঘ্রকে রিক্ত হস্তেই ধরিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু আহমদ কবীর আপন আশ্রমে থাকিয়া প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত গোচর করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল বাঘটাকে দুই হাতে চড় মারিতে মারিতে বন হইতে তাড়াইয়া দিলেই ভাল

হয়। গুরুর হৃদয়ের এই ভাব তৎক্ষণাৎ শিষ্যের অন্তরে প্রতিফলিত হইল, তিনি দুই হস্তে চপটাঘাত পূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে দূর করিয়া দিয়া গুরুসমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।*

[সিদ্ধিলাভ]—এই কার্য্যে গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সিদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শাহজলালকে বলিলেন "বৎস, তোমার অদ্যকার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বাস হইল যে তোমার ও আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা একই প্রকার হইয়া গিয়াছে। আর এই স্থানে তোমার থাকিয়া প্রয়োজন নাই, হিন্দুস্থানের দিকে প্রস্থান কর।" তৎপর স্বীয় সাধনার স্থান হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা আনিয়া শাহজলালের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে যে মৃত্তিকা দিলাম, তাহা অতি যত্নে রাখিবে—যেন ইহার বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ বিকৃত না হয়। ঈদৃশ মৃত্তিকা যে স্থানে পাইবে, সেইখানেই সতত অবস্থান করিবে। এই মৃত্তিকামুষ্টি যে স্থানে পরিত্যাগ করিবে, সেই স্থানের মাহাত্ম্যের আর তুলনা থাকিবে না।" †

---

* এই সামান্য (বা অসামান্য) ঘটনা ফকির শাহ জলালের ভবিষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনার পূর্ব্বাভাস মাত্র। দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র কবল হইতে শরণাপন্ন হরিণকে যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই পরিশেষে শ্রীহট্টাধিপ গৌড়গোবিন্দ কর্ত্তৃক নিরীহ মোসলমানের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বিনা অস্ত্রে তিনি যেমন হিংস্র ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া ছিলেন, তেমনি যুদ্ধোপকরণ ব্যতীতই প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়গোবিন্দকে তিনি রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয় স্থলেই দৃষ্ট হইবে যে মহাত্মা শাহজলাল কাহারও প্রাণ হনন করেন নাই।

† শাহ জলালের জীবনী (সুহেলি এমন) লেখক নসির উদ্দীন হায়দর ঢাকা নিবাসী ছিলেন। পরিশেষে শ্রীহট্টের এই মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া এই সহরেই অবস্থান করেন।

[চাষণি পীর]—শাহজলাল পাথেয় স্বরূপ গুরুর নিকট হইতে এই মৃত্তিকা-প্রসাদ লইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে প্রথমত: বার জন চেলা যুটিলেন, তন্মধ্যে এক জন সেই মৃত্তিকার তহবিলদার হইলেন। তাঁহার উপর এই ভার থাকিল যে তিনি পথিমধ্যে যত জনপদ দেখিতে পাইবেন সমস্তেরই মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া (চাখিয়া) দেখিবেন; যদি কুত্রাপি বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদে এই মাটির সমকক্ষ মাটি মিলে তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা শাহজলালের নিকট জানাইতে হইবে। এই ব্যক্তির নাম হইল চাষণি পীর।

[জন্মস্থান সন্দর্শন]—পরিব্রাজকব্রতে দীক্ষিত হইয়া প্রথমতঃই শাহজলাল জন্মস্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আপন গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তাঁহার তপঃসিদ্ধির কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল, এমন কি এমন প্রদেশের বাদশাহের কর্ণেও তদীয় সুখ্যাতি পৌঁছিতে সমধিক বিলম্ব হইল না।

[পরীক্ষা]—বাদশাহ চতুর রাজনীতিক ছিলেন। ফকির শাহজলালের বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি তদীয় পাত্র মিত্রকে কহিলেন, "দেখ, বহুদিন হইতে আমার এই অভিলাষ যে কোন সিদ্ধ দরবেশ পাইলে তাঁহার মুরিদ (শিষ্য) হইয়া ভক্তিভরে তদীয় সেবা শুশ্রূষা করিব। তবে প্রথমতঃ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব তিনি ঠিক্ সাধু কি না নচেৎ তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ হইবে না।" সুতরাং শাহজলালকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত

বাদশাহ এক কৌশল করিলেন। শরবতের পাত্রে বিষ মিশাইয়া জনৈক ভৃত্য দ্বারা উহা শাহজলালের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাদশাহের আদেশে ভৃত্য সাধুর নিকট শরবৎ রাখিয়া উহা পান করিতে বলিল। ফকিরের অন্তঃকরণ দর্পণের ন্যায় ছিল, উহাতে অন্যের ভাল মন্দ সমস্ত ভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত। তিনি বাদশাহের কূট নীতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভাল মন্দ সমস্তই নিজের অদৃষ্ট ফলকে লিখিত; যে যাহা মনে করে সে সেইরূপই ফল পাইবে। ফকিরের জন্য ইহা অমৃত, কিন্তু দাতার পক্ষে এই শরবৎ প্রাণান্তকারী হলাহল।" এই বলিয়া তিনি শরবৎ পান করিলেন; এদিকে বাদশাহ হঠাৎ গতাসু হইলেন। এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটনায় তাঁহার কপট কৌশল কাহিনী প্রকটিত হইয়া পড়িল।

[এমনের প্রহ্লাদ]—বাদশাহের পুত্র শেখ আলী এই সমাচার অবগত হইয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শাহজলালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া সতত সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শাহজলাল ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং রাজকুমারকে দেশে থাকিয়া দয়াবান্ ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

[রাজপুত্রের বৈরাগ্য]—শাহজলাল জন্মভূমি হইতে চির-বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজপুত্রের দেশে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল; রাজ্যধন

প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার আসক্তি রহিল না; নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতিও তিনি দৃষ্টি করিলেন না। সাধু শাহজলালের পবিত্র সঙ্গসুখ তাঁহার প্রবল বাসনার বিষয়ীভূত হইল। তিনি অমাত্য স্বজনের চক্ষু এড়াইয়া শাহজলালের অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং চতুর্দ্দশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। প্রবল অনুরাগের নিদর্শন পাইয়া শাহজলাল রাজকুমারকে আপনার প্রিয় সহচর ভাবে গ্রহণ করিলেন।

[ভারতবর্ষে আগমন]—শাহজলাল দলবলসহ দিল্লী নগরীতে আসিলেন। সেইখানে তখন নেজাম উদ্দীন নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ পীর থাকিতেন। তাঁহার নিকট তদীয় এক শিষ্য আসিয়া শাহজলালের বিষয়ে কহিল, "আরব হইতে এক দরবেশ আসিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র অতি অদ্ভুত। এই সাধু স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত। তিনি চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথ চলেন। আবাস গৃহে তিনি একটি বালককে নিজের সাক্ষাতে রাখেন, এবং তাহাকে প্রাণাধিক প্রেমাস্পদের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোনও কর্ম্ম দেখা যায় না।" *

[নেজাম উদ্দীন ও শাহজলাল]—পীর নেজাম উদ্দীনের মনে একটু খট্‌কা বাঁধিল। তিনি শাহজলালকে তাঁহার নিকটে আসিতে আহ্বানকরণার্থ একজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্য শাহজলাল সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি উহার মনের

* এই উক্তি দ্বারা শাহজলালের জীবনীর একটি রহস্যময় ক্ষুদ্রচিত্র গোচরীভূত হইবে।

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং কিছু না বলিয়া একটা কৌটায় কিছু তূলা এবং আগুন রাখিয়া বন্ধ করিয়া শিষ্যের হাতে উহা নেজাম উদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নেজাম উদ্দীন কৌটা খুলিয়া অগ্নি ও তূলা দেখিয়া শাহজলাল তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। বাস্তবিক তপস্বী নেজাম উদ্দীনের তূলাসদৃশ সাদা ও কোমল ধর্ম্মিষ্ঠ অন্তঃকরণে যে শাহজলালের প্রতি সন্দেহ বহ্নির স্থান পাইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, যোগসিদ্ধ শাহজলালের উহা বুঝিতে পারা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

[জলালী কবুতর]—নেজাম উদ্দীন নিজকে অপরাধী মনে করিয়া স্বয়ং শাহজলালকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। দেবালয়, রাজা ও সাধুর নিকট কেহ রিক্ত হস্তে যায় না। নেজাম উদ্দীনের দুই জোড়া কাজলা রংএর কবুতর ছিল, তাহাই নিয়া সাধু শাহজলালকে উপহার প্রদান করিলেন। বোধ হয় শাহজলালের এই কপোত চতুষ্টয়ই পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে জলালী কবুতরের প্রাতুর্ভাবের নিদান। পারাবত মাংস এই অঞ্চলে ভক্ষ্য হইলেও জলালী কবুতর কেহই হিংসা করে না।

[গৌড় গোবিন্দ]—তখন শ্রীহট্টে গৌড় গোবিন্দ নামে এক অত্যাচারী ভূস্বামী ছিলেন। তাহার জন্ম গৌড় দেশে (বাঙ্গালার মধ্যে) ছিল বলিয়া তাঁহার নাম গৌড় গোবিন্দ হইয়াছিল। +

+ এই গোবিন্দ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইতেছে তাহা সুহেলি এমনের মত। আমাদের স্বীয় ধারণা এই যে 'গৌড় গোবিন্দ' প্রকৃতপক্ষে 'গুরু গোবিন্দ' ছিলেন। তিনি

গৌড়েরোয়া উপাধি বিশিষ্ট জনৈক শাহজলাল কর্ত্তৃক জন্মস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া গোবিন্দ পলাইয়া শ্রীহট্টে আসেন এবং এখানে প্রভুত্ব লাভ করেন। ইনি এক প্রসিদ্ধ যাদুকর ছিলেন, বহু ভূত প্রেত তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। * মোসলমানগণ তাঁহার দ্বারা অত্যাচারিত হইত।

[বুরহান্ উদ্দীন]—শ্রীহট্ট সহরে টুলটেকর নামক মহল্লায় শেখ বুরহান উদ্দীন বাস করিত। তাহার সন্তানাদি বহুকাল না হওয়ায় সে মানস করে যে ছেলে হইলে খোদার নিকট একটি গরু কুরবাণি করিবে। যাহা হউক কালে তাহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বুরহান উদ্দীনও তাহার মানস আদায় করিল। দৈবাৎ এক চিল এক টুকরা গোমাংস নিয়া গৌড়গোবিন্দের বসতি স্থলে ফেলিয়া দিল। হিন্দু রাজা গোবিন্দের তাহা অসহ্য হইল; তৎক্ষণাৎ তিনি গোহত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিলেন। যে উদ্দেশ্যে ও যৎকর্ত্তৃক গোবধ হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়া তিনি বুরহান ও তাহার পুত্রটিকে ধরিয়া আনাইলেন এবং পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া পিতার হস্তচ্ছেদন করিয়া

...নিয়া বা সিণ্টেঙ্ জাতীয় লোক ছিলেন। শ্রীহট্ট সহর হইতে ৬।৭ মাইল ব্যবহিত স্থান হইতে পাতর সংজ্ঞক যে সকল ব্যক্তি সহরে পাতা কাঠ কয়লা প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহাদিগকে 'গুরু গোবিন্দ' বলিয়া পরিচয় দিতে শুনিয়াছি। যাহা হউক গৌড় গোবিন্দ বিষয়ে যে নানারূপ প্রবাদ এদেশে প্রচলিত, পূর্ব্ব প্রবন্ধেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

* বোধ হয় গোবিন্দ তান্ত্রিক সাধনায় পিশাচাদি সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্ত্রপ্রধান কামরূপ প্রদেশান্তর্গত স্থানের অধিবাসীর পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। মোসলমান লেখকের পক্ষে সুতরাং তাঁহাকে যাদুকর সংজ্ঞাদানও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

দিলেন। দারুণ পুত্রশোকে ও নিজের হস্তচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণায় হতভাগ্য শেখ ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। *

[প্রতিশোধের কল্পনা]—বুরহান উদ্দীন অপমানে ও মনঃক্লেশে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করিল। অত্যাচারের প্রতিহিংসার উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে নব প্রতিষ্ঠিত মোসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইল। তৎকালে সোলতান আলাউদ্দীন শাহ দিল্লীর সিংহাসনাধিষ্ঠিত ছিলেন। বুরহানের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বাদশাহের মনে দুঃখ হইল; তিনি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ অবশ্য কর্ত্তব্য ভাবিয়া স্বাপন ভাগিনেয় সিকান্দর শাহকে শ্রীহট্টাভিমুখে সসৈন্যে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং গৌড় গোবিন্দকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে হুকুম দিলেন।

[সিকান্দর শাহের অভিযান]—সিকান্দর বাদশাহের আদেশ ক্রমে সৈন্য সরঞ্জাম লইয়া যুদ্ধার্থ রোওয়ানা হইয়া কিছুদিন পরে ঢাকা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি সোনারগাঁওএ ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলে, শ্রীহট্টে তদীয় অভিযানের সংবাদ পৌঁছিল।

* স্থহেলি এমনের মোসলমান গ্রন্থকার হিন্দুগণ কি চক্ষে গরুকে দেখেন তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শেখ বুরহান উদ্দীন হিন্দু রাজার অধিকার স্থলে থাকিয়াও ততটা বিবেচনা করে নাই—নচেৎ গোবধ মানস করিত না। রাজা গৌড় গোবিন্দ অতি নৃশংস শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। বুরহানের শেখ উপাধিতে বোধ হয় সে কিংবা তাহার পিতৃপিতামহ পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। গৌড় গোবিন্দও আমাদের মতে হিন্দুধর্ম্মে নব দীক্ষিত পার্ব্বত্য জাতীয়। এই উভয়েই অভিনব পরিগৃহীত ধর্ম্মে অন্ধ বিশ্বাসমূলক অবিমৃষ্যকারিতা দৃষ্ট হইবে।

[গোবিন্দের অগ্নিবাণ]—গৌড়গোবিন্দ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষালাভ করিবার জন্য যথাযুক্ত আয়োজন করিলেন। তাঁহার অধীন যত ভূতপ্রেত ছিল তাহারা যাদুর সরঞ্জাম তৈয়ার করিল। সিকান্দরের সৈন্যমধ্যে অগ্নিবাণ * চালান হইল। মোসলমান সৈন্যগণ কখনও এই প্রকার যাদু দেখে নাই—উহার প্রতিপ্রসব কিছু আছে কি না তাহাও জানিত না। বহু লোক পুড়িয়া মরিল, অনেকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পলায়নপর হইল। সিকান্দরের প্রথম উদ্যম এইরূপে বিফল হইলেও, তিনি আরও দুইবার সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনও মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

[বুরহান উদ্দীনের অন্য চেষ্টা]—বেচারা বুরহান উদ্দীন দেখিল গোবিন্দের যুদ্ধে পরাজয় সুদূরপরাহত। সে তখন খোদা তাল্লার কৃপাই একমাত্র ভরসার স্থল ভাবিয়া মদিনায় হজরত মোহাম্মদের কবরে গিয়া আত্মদুঃখ জ্ঞাপন করিতে সংকল্প করিল। কিন্তু ততদূর তাহাকে যাইতে হইল না।

[শাহ জলালের শ্রীহট্টাভিমুখে অভিযান]—তখন মক্কা মদিনা যাইতে দিল্লী হইয়া যাইতে হইত। বুরহান দিল্লী গিয়া শাহ জলালের দর্শন লাভ করিল। মহাত্মা শাহজলাল বুরহানের শোকাবহ কাহিনী শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তাহার অপ-

* অগ্নিবাণ কামান-বন্দুক কিনা কে বলিতে পারে? ইহার প্রস্তুত প্রণালী সাধারণে অবিদিত ছিল, তাই ইহা যাদুগিরি বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।

মানের প্রতিশোধ কল্পে গোবিন্দের যাদু দমনে বন্ধপরিকর হইয়া সশিষ্য শ্রীহট্টাভিমুখে রোওয়ানা হইলেন।

[সিকান্দরের সাহায্য প্রার্থনা]—গোবিন্দের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সিকান্দর বাদশাহের সমীপে নিজের অদ্ভুত পরাজয় বার্ত্তা সবিস্তর জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়া সোলতান আলাউদ্দীনের বুদ্ধি লোপ পাইল। উজীর নাজির গণক প্রভৃতি দরবারের যাবতীয় ব্যক্তি উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শে বসিয়া গেলেন।

[অদ্ভুত উপায়]—বহু পাঁজি পুথি দেখিয়া গণনা করিয়া এরূপ এক ব্যক্তির ঠিকানা বাহির হইল, যাঁহার দ্বারা এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার নাম না বলিলেও পরিচয় পাইবার এক ফিকির বলা হইল। বাদশাহের যত সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন সকলকেই যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া ডেরাখিমা ময়দানে বাহির হইতে বলা হউক। ময়দানে শিবির সংস্থাপন হইলে, সন্ধ্যার সময় এক বাতাস বহিবে। বাতাসে তাবৎ তাঁবুর প্রদীপ নিবিয়া যাইবে, কেবল একটীতে প্রদীপগুলির কিছুই হইবে না। সেই তাঁবুর মধ্যে যাঁহাকে পাওয়া যাইবে তিনিই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি।

[সৈয়দ নসির উদ্দীন সেপা সালার]—এই উপায়ে সৈয়দ নসির উদ্দীন নামক এক মহাত্মার উদ্দেশ পাওয়া গেল। তাঁহার জন্মস্থান বাগদাদ। তিনি ঐ খানে আউলিয়া দলের সরদার ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মাওসুফ নামক বাগদাদ প্রদেশাধিপতির সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর

বাদশাহের অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ সেফায়েৎ জানিয়া বাদশাহ তাঁহাকে সেপাসালার উপাধি প্রদানপূর্ব্বক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বৃত করিলেন এবং অনেক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া সিকান্দর শাহের সহায়তা নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। যেখানে পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী গঙ্গা ও যমুনা সম্মিলিত হইয়া হিন্দুর পরম তীর্থ প্রয়াগের মহিমা সংবর্দ্ধিত করিয়াছে সেই আল্লাবাদ সহরেই সেপাসালারের বাহিনী ও শাহজলালের অনুচরবর্গের পরস্পর সম্মিলন হইল। সেই গঙ্গা যমুনার সম্মিলিত প্রবাহের ন্যায় এই দুই মহাত্মা একত্র হইয়া পশ্চিমাভিমুখে একই উদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন।

[৩৬০ অনুচর]—পথিমধ্যে একে একে সঙ্গিসমূহ যুটিতে লাগিলেন। ক্রমে শাহজলালের ৩৬০ জন আউলিয়া অনুচর হইলেন—তন্মধ্যে সেপাসালারই সকলের সর্দ্দার বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

[শ্রীহট্টের সীমান্তে প্রবেশ] —যেখানে সিকান্দর পরাভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন শাহজলাল সানুচর সেইখানে পৌঁছিলেন। তখন গৌড়গোবিন্দের যাদুগিরির বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীহট্টে যাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যগ্র হইলেন এবং সিকান্দরকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইতে হইল,—কিন্তু নৌকা মিলিল না। তখন শাহজলাল নমাজের আসন খানি বিছাইয়া দিলেন তাহাতে আরোহণ করিয়াই সমস্ত লোকজন নদীপার হইল। বর্ত্তমানে যে স্থান চৌকি পরগণা

বলিয়া বিখ্যাত সেইখান পর্য্যন্তই তখন শ্রীহট্ট রাজ্যের সীমানা ছিল। যখন শাহজলাল ঐ স্থানে আসিয়া পড়িলেন, গোবিন্দ তখন তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিলেন।

[অগ্নিবাণ বিফল]—গোবিন্দ দস্তুরমত অগ্নিবাণ চালান দিলেন। কিন্তু সাধু শাহজলালের আশ্রিত কটকের উপর যাদুগিরির ফল বিপরীত হইল। তাঁহার নিজের শিবির ও দ্রব্য সামগ্রী পুড়িয়া ছারখার হইল। রাজা চমৎকৃত হইয়া অমাত্য-গণের পরামর্শ চাহিলে, তাহারা রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতেই মন্ত্রণা দিল। তাহারা কহিল "মহারাজ, এ সিকান্দর শাহ নহে যে অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরিবে; এই সৈন্যদলে এমন এক বীর আছেন, যাঁহার ভয়ে জঙ্গলের বাঘ পলাইয়া যায়; মন্ত্র তন্ত্র কিছুতেই তাঁহার কিছু হইবে না। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আপনি না গেলে, অগত্যা আমাদিগকে বিদায় দিউন।"

[লৌহধনুতে গুণ যোজনা]—গোবিন্দ আর এক ফিকির উদ্ভাবিত করিলেন। লৌহ দ্বারা এক ধনু নির্ম্মাণ করাইয়া শাহজলালের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন যে ইহাতে গুণ আরোপ করা হইলে তিনি শ্রীহট্ট ছাড়িয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে শাহজলাল সৈন্যসহ বাহাদুরপুরের কাছ দিয়া বরাক নদী পার হইলেন। তাঁহার; নিকটে লৌহধনু পৌঁছিলে, তিনি স্বয়ং গুণ যোজনা না করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে যাহার আছ্‌সরের নমাজ কোনও দিন বাধা হয় নাই তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া

হাজির করিতে হইবে। সমস্ত শিবির অনুসন্ধান ক্রমে সেপাসালার নসিরুদ্দীনকেই মাত্র ঈদৃশ নিয়মনিষ্ঠ পাওয়া গেল। শাহজলাল তাঁহাকেই ধনুতে গুণ যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। নসিরুদ্দীন ভগবন্নাম স্মরণপূর্ব্বক অনায়াসে লৌহধনুতে গুণ আরোপ করিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। ধনু গোবিন্দের নিকট নীত হইলে তিনি জয়ের আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন।

[সর্পপেটিকাভ্যন্তরে গোবিন্দ]—কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে গোবিন্দের বাসনা হইল শাহজলালের সন্দর্শন লাভ করেন। প্রকাশ্য ভাবে ফকিরের সাক্ষাৎ যাইতে আশঙ্কা করিয়া তিনি এক ফন্দী করিলেন। সাপের পেটিকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া তিনি শাহজলালের সম্মুখে নীত হইলেন এবং উহার ভিতর হইতে তাঁহাকে এক নজর দেখিয়া লইলেন। শাহজলাল ভিতরকার ব্যাপার প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারিলেন—তাই সাপের খেলা দেখিবার পর পেটেরাগুলির অভ্যন্তর পরীক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দের আশ্রয়ীভূত পেটেরাটিকেই খুলিয়া দেখাইতে আদেশ দিলেন। বাহকেরা আপত্তি করিলে শাহজলাল গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।

[গোবিন্দের পরাজয় স্বীকার]—গোবিন্দ অবনত মস্তকে পেটেরা হইতে বাহির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে অঙ্গীকার করিলেন। অপিচ শাহজলালের কোনও কাজ তিনি করিয়া দিতে পারেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা

করিলেন। তখন শাহজলাল একটি মস্‌জিদ তৈয়ার করিবার নিমিত্ত কিছু পাথর দিবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন। গোবিন্দ তাঁহার ভূতপ্রেতাদি দ্বারা এত প্রস্তর আনাইয়া দিলেন যে তদ্দ্বারা বহু মস্‌জিদ্ প্রস্তুত হইল। তন্মধ্যে চৌকিদীঘী নামক স্থানের আদিনা মস্‌জিদই প্রধান; ইহার ১২০টা গুম্বুজ ছিল এবং ইহাতে সকলে জুম্মার নমাজ পড়িত *।

[গোবিন্দের পরিণাম]—শাহজলালের আদেশ প্রতিপালন পুরঃসর গোবিন্দ তাঁহার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কি দশা হইয়াছিল কেহই তাহা ঠিক বলিতে পারে নাই। তবে কেহ কেহ না কি সহর হইতে প্রহর পরিমাণ দূরবর্ত্তী পেঁচাগড় নামক স্থানে তাঁহাকে পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত এবং কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় এখনও দেখিতে পায়!

[শাহজলালের শ্রীহট্ট সহরে প্রবেশ]—বলা বাহুল্য, এখন নিষ্কণ্টকে শাহজলাল শ্রীহট্ট সহরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। সূর্ম্মা নদী, ব্রহ্মপুত্র ও বরাকের ন্যায়ই, বিনা নৌকায় পার হইলেন। সহরে মোসলমান প্রভাব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। বুরহান উদ্দীন ও তদীয় ধর্ম্মভ্রাতৃগণের মনোদুঃখ দূর হইল।

[মৃৎ পরীক্ষা]—গুরুদত্ত মৃত্তিকার পরীক্ষক চাষণি পীর সহরের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে যেখানে

---

* তৎপর নবাবি আমলে ইউসুফ্ ইনদিয়ার খাঁ নামক একজন নবাব ঐ সকল গুম্বুজ ভাঙ্গিয়া ইট পাথর আনিয়া বর্ত্তমান কবরের নিকটে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সাধুর সমাধি স্থান রহিয়াছে, সেই টীলার মাটিই বর্ণ গন্ধ ও স্বাদে ঐ মাটির সমান হইল। তাই মহাত্মা শাহজলাল সেইখানেই অবস্থাননিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া অবিরত ভগবদুপাসনায় কাল-কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

[অনুচরবর্গ]—তিনশতষাট্‌সংখ্যক আউলিয়ার মধ্যে অল্প কয়েকজন এবং এমনের রাজকুমার শাহজলালের সঙ্গে থাকিলেন। অন্যেরা শ্রীহট্টের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত হইলেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলের তথা পূর্ব্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মোসলমানদিগের অধিকাংশই এই আউলিয়াগণের মধ্যে কাহারও না কাহারও বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

[শ্রীহট্টের শাসন কার্য্য]—সিকান্দর শাহ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনিও সাধুর আদেশ মতেই কার্য্য করিতেন। নগরে সুশাসন প্রচলিত হইল, জোর জুলুমের লেশও থাকিল না।

[সিকান্দরের ভ্রম]—গ্রীষ্মপ্রধান স্থান হইতে আসা হেতু শাহজলালের সহচরবর্গ শিশিরাগমে শ্রীহট্টের শীতে নিতান্ত অভি-ভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা শীত বস্ত্রের জন্য সাধুকে ধরিলেন। শাহজলাল একদা সিকান্দর শাহকে কহিলেন "দেখ, দারুণ শীতের সময় আসিয়াছে, যাহাতে শীত নিবারণ হয়, জরুর এমন উপায় করিবে।" সিকান্দর বিষয়ী লোক, তিনি এই সামান্য কথার বিপরীত অর্থ করিলেন। শীত নিবারক কম্বলের আয়োজন না করিয়া শাহজলালের নিমিত্ত শীতহারিণী বনিতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

[সিকান্দরের পরিণাম]—অনেক চেষ্টায় পরম সুন্দরী এক রমণী জোগাড় করিয়া সিকান্দর শিবিকায় তাহাকে শাহজলাল সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সাধু পরিতাপ করিয়া বলিলেন, "হায় সিকান্দর নিজে যেরূপ ডুবিয়াছে, আমাকেও কি সেইরূপ ডুবাইবে? আমি দীনহীন ফকির, মজঃরদ, আমার জন্য কি এই ব্যবস্থা?" ইহার কিছু পরেই সংবাদ আসিল, সিকান্দর শাহ সূর্ম্মানদী পার হইতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখন কোনও রূপ তুফান বা তরঙ্গ কিছুই ছিল না। বহু অনুসন্ধানেও সিকান্দরের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। তাঁহার স্থলে অন্য লোক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

[রমণীর পরিণয়]—শাহজলালের সঙ্গে তদীয় প্রিয়তম যে সকল শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে হাজি ইউসুফের প্রতি আদেশ হইল যে তিনি সিকান্দরের প্রেরিত রমণীর যথারীতি পাণিগ্রহণ করেন। হাজিও সংসারবিরক্ত ছিলেন, তাই ধনদৌলতের অভাব এবং সাংসারিক ধর্ম্মে বীতস্পৃহতা জানাইয়া পরিহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শাহজলাল তাঁহাকে নানা যুক্তি ও নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনশ্চ আদেশ করাতে তিনি অগত্যা স্বীকার করিলেন। এই পরিণয়জাত সন্তানগণের বংশধরেরাই এক্ষণে সাধুর সমাধির তত্ত্বাবধায়ক এবং ইঁহাদের সরদার সকুমও এই বংশজাত।

[সূর্ম্মার জল সংস্করণ]—শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে বুন্দাসিল নামক

পরগণার নিকট দিয়া সূর্ম্মা নদী প্রবাহিত হইত। তথায় জিয়া উদ্দীন নামক শাহজলালেরই জনৈক অনুচর থাকিতেন। তিনি নদীর জল বিস্বাদ দেখিয়া তাহার সংস্কারবিধানার্থ সাধুকে একবার সেইস্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তের আহ্বানে শাহজলাল সেই স্থানে গিয়া নমাজ পড়িয়া একখণ্ড প্রস্তর জলে ফেলিয়া দিলেন, ইহাতেই জল বিশুদ্ধ হইল।

[ভূত প্রেত দমন]—বুন্দাসিল যাইবার পথে কুশী নদীর তীরে এক ভূত ছিল ; সে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার কালে ধূলি উড়াইয়া চলিত। শাহজলাল উহাকে মারিয়া ধূলিতে মিশাইলেন। বুন্দাসিলেও অপর এক দেও (দৈত্য) ছিল ; সাধু তাহাকেও সংহার করিয়া ঐ স্থানের নাম দেওরাইল রাখিলেন। অদ্যাপি পরগণার সেই নামই প্রচলিত আছে।

[গোবিন্দের দুর্গ ধ্বংস]—একদা শাহজলাল আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতে ছিলেন। হঠাৎ রাজা গৌড়গোবিন্দের দুর্গ তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই দুর্গের মালিক যাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারও সেই অবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কেন না তাহা হইলে গৌড়গোবিন্দের চিহ্ন মাত্রই সহরে থাকিত না।" তাঁহার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র ঐ দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

[রমণী ও পুষ্করিণীর বিলোপ]—শাহজলাল জীবনে নারীমুখ দেখেন নাই ; একদিন তাঁহার গৃহের উত্তর দিকস্থিত জলাশয়ে

একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল। তাহার আলুলায়িত কেশ-পাশে ও অনাবৃত বক্ষঃস্থলে সাধুর দৃষ্টি পড়িল। ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় তিনি "ইহা কি" তাহা পার্শ্বস্থ অনুচরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। পরে উহা স্ত্রীমূর্ত্তি জানিতে পারিয়া তিনি সাতিশয় বিরক্তি সহকারে বলিলেন "এই পুষ্করিণীতে যদি রমণীমূর্ত্তিই দেখিতে হইল তবে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইবে না কেন?" তৎপর স্ত্রীলোক বা পুকুর কিছুরই চিহ্ন মাত্র কেহ আর দেখিতে পাইল না।

[কূপ খনন ও জমজমের জলানয়ন]—বিধর্ম্মীর খোদিত জলাশয়ের জল ব্যবহার করিতে সাধুর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি একটি কূপ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মক্কাস্থিত পবিত্র জমজমের জল যাহাতে ঐ কূপে আইসে তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন। নিজের হাতের লৌহ যষ্টিও কূপে নিক্ষেপ করিলেন। সাধুর মনস্কামনা পূর্ণ হইল; জমজমের জল কূয়ায় আবির্ভূত হইল। এই কূপ সম্প্রতি ইষ্টক গ্রথিত হইয়াছে, এবং ইহা হইতে একটা নালা বাহিয়া অনবরত জল নির্গত হইতেছে।* বিশ্বাসী ভক্তগণ অনেকে ইহার জল খাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছে এবং মোসলমানগণ রোজার সময় এই জলে আচমন করিয়া পারণা করিয়া থাকে।

[কূপের পরীক্ষা]—শ্রীহট্ট সহরের অনতিদূরস্থ খিত্তা পরগণার জনৈক মোসলমান একদা তীর্থ ভ্রমণে মক্কা-মদিনায় গিয়াছিল। তাহার খরচ পত্র বাদে নয়টি স্বর্ণমুদ্রা উদ্বৃত্ত হইয়া-

* এই কূপটি একটা প্রস্রবণ বিশেষ।

ছিল। ঐ গুলি সঙ্গে নিয়া চলিলে চুরি হইবে মনে ভাবিয়া সে একটা কাঠের ডিবা মধ্যে মুদ্রাগুলি পূরিয়া মক্কার জমজমের জলে ফেলিয়া দিল এবং প্রার্থনা করিল যে যদি শাহজলালের কূয়ায় প্রকৃতই জমজমের জল গিয়া থাকে তবে তাহার ডিবাটিও যেন ঐ কূপে যায়। এদিকে কূপ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত এক খাদিম কূয়ায় নামিয়া একটা ডিবা পাইয়া তাহা নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। দুই বৎসর পরে যখন তীর্থযাত্রী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল তখন সে তাহার ডিবা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত খাদিম হইতে বাহির করিল এবং নয়টি স্বর্ণমুদ্রা হইতে দুইটি দরগাতে প্রণামী দিয়া গেল।

[শাহজলালের তিরোভাব ও সমাধি]—শ্রীহট্টে আসিয়া শাহজলাল ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই স্বীয় গৃহে বসিয়া সাধনায় কাটাইতেন। তাঁহার বয়স যখন ৬২ বৎসর তখন তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। যে স্থলে তাঁহার আশ্রম ছিল সেই স্থলেই তাঁহার সমাধি হইল। এই সমাধি স্থানেরই পার্শ্বে এমনের ভক্ত রাজকুমারের সমাধি বর্ত্তমান। শাহজলালের সমাধি স্থল প্রকৃতই শ্রীহট্টকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

[প্রদীপ, কার্ত্তিক ১৩১২।]

সুখ ও দুঃখ।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

জগতে যে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, উহার মূলে সুখ লাভের ও দুঃখ মোচনের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখা যায়। ঐ যে রবিরশ্মিপ্রপীড়িত গলদ্‌ঘর্ম্ম কৃষাণ বহু কষ্টে হল চালনা করিতেছে; ঐ যে দারুণ শীতের সময় মৎস্যজীবী জলাশয়ের সুশীতল জল মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে; ঐ যে বিদ্যালয়ের ছাত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা নিশি গ্রন্থাধ্যয়নে স্বীয় শরীর [illegible]াবশিষ্ট করিতেছে; ঐ যে আফিসের কর্ম্মচারী প্রভুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাণপণে খাটিয়া শরীর পাত করিতেছে, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরিণামে সুখলাভ ও দুঃখাপনোদন। কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টকোদ্ধার হয়, তদ্রূপ আপাতক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কি কৃষাণ, কি মৎস্য জীবী কি ছাত্র, কি কর্ম্মচারী সকলেই ভবিষ্য দুঃখ নিবারণের তথা সুখ প্রাপ্তির উপায় সাধন করিতেছে।

সুখের জন্য সকলে লালায়িত হইলেও, রুচি ভেদে, প্রকৃতি ভেদে ও শিক্ষার তারতম্যে, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ত্ম অনুসরণ পূর্ব্বক সুখান্বেষণ করিতেছে। আমার যাহাতে সুখ, অপরের

পক্ষে হয়ত তাহা ক্লেশজনক হইতে পারে। একটা স্থূল কথাই ধরা যাউক। সংসার সুখ আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষার জিনিস; কিন্তু শুক দেবের পক্ষে তাহা বিষবৎ হেয় পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

মানুষের সুখ ও দুঃখ তাহার মানসিক বা শারীরিক অনুভূতি মাত্র। সুতরাং মনের বা শরীরের অবস্থার উপর উহা অনেকটা নির্ভর করে। উপস্থিত যে কার্য্যে আমার অপরিসীম সুখ, সময়ান্তরে, মনের ভাবান্তর হইলে, সেই কার্য্য দারুণ দুঃখ জনক হইতে পারে। আবার রুগ্ন ব্যক্তি বা স্থবিরের পক্ষে যাহা ক্লেশকর, এক সুস্থকায় ব্যক্তি বা যুবকের পক্ষে তাহা সুখজনক হইয়া থাকে।

সংসারের সকলই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং সুখ-দুঃখও অচির-স্থায়ী। আজ যাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হই, কাল তাহারই প্রীতিপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ লাভ করি। ফলতঃ, নিরবচ্ছিন্ন সুখী কি দুঃখী লোক জগতে অতি বিরল।

সুখ বা সুখের আশা সকলেরই হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতি হীন দরিদ্র, বিষম-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, যাহার এজগতে আপনার বলিতে কিছুই নাই তাহাকে দেখিয়া মনে করিতে পার, বুঝি, এই ব্যক্তি আপনার দুঃখময় জীবনের অবসান সততই কামনা করিতেছে; কিন্তু যদি কেহ উহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত খড়্গ হয়, দেখিবে, সে প্রাণপণে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিবে। অবশ্যই কোনও সুখের আশাবন্ধ তাহার জীবনের অবলম্ব হইয়া রহিয়াছে।

আবার দুঃখানুভূতিও আপামর সকলেরই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। তোমার দৃষ্টিতে যাঁহাকে আজন্ম সুখী দেখিতেছ যিনি মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গের ভোগ সুখ অনুভব করিতেছেন মনে কর, সেই অসামান্য সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে, কোনরূপ শোক বা দুঃখের স্মৃতি তাঁহার চিত্ত বিক্ষোভিত করিতেছে।

একটি গল্প বলিতে হইল। কোনও রাজা তদীয় সন্তানের মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনরূপে প্রবোধ দিতে না পারিয়া এক দিন তাঁহার সুচতুর মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার একটী মুক্তার বাগান আছে. ইচ্ছা করিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রাতঃকাল ভিন্ন উহা দেখান যাইতে পারে না। মন্ত্রীর উদ্যানে এক সর্ষপ ক্ষেত্র ফলিত হইয়াছিল। হৈমন্তিক প্রভাতে শিশির বিন্দু ক্ষেত্রোপরি উপচিত হইয়া অনতিপ্রখর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণপ্রভায় ঝলমল করিতে করিতে মুক্তাফলের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিল। দূর হইতে ঐ শোভা রাজাকে প্রদর্শন করাইয়া মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, এজন্মে যে ব্যক্তি কখনও কোন শোক দুঃখের অধীন হয় নাই একমাত্র সেই ব্যক্তি উহার সমীপস্থ হইতে কিংবা ঐ মুক্তা ফল আহরণ করিতে পারিবে। রাজা. ঐরূপ ব্যক্তি কেহ আছে কিনা রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিলেও এতদবস্থ কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন মন্ত্রী রাজাকে বুঝাইলেন যে; যখন জগতের সকলেই শোক দুঃখের অধীন, তখন স্বীয় শোককে

মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবিনী একটী অবস্থা ভাবিয়া উহা সংবরণ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

সুখের অর্জ্জনও দুঃখের বর্জ্জন জীবের প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইলেও স্বীয় বুদ্ধির ত্রুটীতে বা অসাবধানতার ফলে কৃত কর্ম্মের জন্য জীবকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব, সুখ ও দুঃখ অনেকটা নিজ কর্ম্মের ফলাফল। সুপথে চলিয়া সৎকর্ম্ম করিলে সুখ ও কুপথে চলিয়া কুকর্ম্ম করিলে দুঃখ হয়, ইহা অতি সাধারণ নীতি সূত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যাহারা কুপথে চলিয়া কুকর্ম্ম করে, তাহারা নিজের বিকৃত বুদ্ধিতে ঐ কর্ম্মে সুখ লাভ করিবে ভাবিয়াছিল; কেন [illegible] পূর্ব্বেই [illegible] হইয়াছে সুখ প্রাপ্তিই মানবের সমুদয় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, [illegible] বিকৃতি [illegible] জীবের দুঃখ হয়, এতদ্দৃষ্টেই বুঝি বা পাশ্চাত্ [illegible]গণের মতে বুদ্ধি-বৃক্ষের ফলাস্বাদনে দুঃখের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়া[illegible]

এতদ্-ব্যতীত সুখ-দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে [illegible]তর [illegible] নির্ভর করে। নিয়তি বা অদৃষ্ট কেবল [illegible] প্রাচীন জগতেই মান্য হইত এমন নহে; অধুনাতন দার্শনিকগণের মধ্যেও উহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, সদুদ্দেশ্যে সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহার ফলে কর্ম্মকর্ত্তার ও সাধারণের সুখ ধ্রুব; কিন্তু হঠাৎ সমস্তই যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, প্রাচীনতম পদ কর্ত্তার সঙ্গে বলিতে হইল—

* ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যকেই যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের নিদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥"

শাশ্বতিক সুখ লাভ বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যদিও আবহমান কাল হইতে মানব [illegible] নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা পাইতেছে, তথাপি এযাবৎ উহার কোন ধ্রুব উপায় কি কৌশল আবিষ্কৃত হইল না। চিন্তাশীল দার্শনিকগণ জগৎকে দুঃখময় জ্ঞান করিয়া, কিসে সুখ, উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন; ভাবুক কবিগণ নানাভাষায় নানাচ্ছন্দে উহারই অনুশীলন করিয়াছেন; এবং পারমার্থিক সাধুগণেরও উহাই সাধনার বিষয়; কিন্তু যত দিন জগতে [illegible] রুচিহি লোকঃ"—এই প্রবাদ থাকিবে, তত [illegible] বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত সুদূর-পরাহত। পরন্তু [illegible] প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সুখ ও দুঃখের মাত্রা [illegible] ও বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত প্রহেলিকাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

এখন প্রকৃত সুখী কে, এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। একবার বকরূপী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির মহারাজকে ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥"

দিনান্তে একবার যে ব্যক্তি শাক মাত্র আহার করে অথচ ঋণ জালে জড়িত হয় না এবং (ধন লোভে) দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে না, সেই ব্যক্তিই সুখী। ফলতঃ যদি অভাবই দুঃখের মূল বলিয়া

ধরা যায় তবে যে ব্যক্তির কোন অভাব বোধ নাই, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্টি আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।

সুখের মূল সন্তোষ ও দুঃখের মূল অভাব। নিদান স্থির হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সন্তুষ্টির অনুশীলন ও অভাবের হ্রস্বীকরণ সুখ লাভের ও দুঃখাপনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। ভিন্ন করিয়া বলিলেও ঐ দুইটী একই কথা; যেহেতু সুখ ও দুঃখ উভয়ের মধ্যে এমনই সম্বন্ধ যে একের আবির্ভাবে অপরের তিরোধান সূচিত হয়।

আমরা সচরাচর যে সকল উপভোগের সামগ্রীকে সুখের উপাদান বলিয়া মনে করি. উহারা অনেকেই সন্তোষের অন্তরায় ও অভাবের প্রকৃত জনক। উহারা করিবে, সন্তোষ ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে অনুবন্ধী নূতন নূতন অভাবের আবির্ভাব হইতে ঋষি শাপে রাজা যযাতির অকাল বার্দ্ধক্য হইয়াছিল। এ যৌবন কাল তাহাতে আবার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা; রাজার এমন অবস্থায় বার্দ্ধক্যের উদয়ে মনে হইল, “হায়, জন্মের মত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম; এমন কেহই কি নাই যে কিয়দ্দিন আমার জরাভার বহন করে? তাহা হইলে ইতি মধ্যে আমার ভোগসুখলালসটা চরিতার্থ করিয়া লইতে পারিতাম।” কনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির জরাভার অঙ্গীকার করিলেন। রাজা সুদীর্ঘকাল যৌবনলীলার সুখ ভোগ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে বুঝিলেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়া ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে॥"

ঘৃতাহুতিতে যেমন অগ্নি উদ্দীপিত হয় মাত্র, নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ উপভোগ দ্বারা বিষয়[illegible] নিবারিত না হইয়া কেবল পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষাই সুখ ভোগের অন্তরায়; কারণ আকাঙ্ক্ষামাত্রেই অভাব, অর্থাৎ দুঃখের নিদান, জড়িত থাকে। সুতরাং ভোগ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান অপেক্ষা দমনের অনুশীলনই কর্ত্তব্য, ইহাতে ভোগ সুখের অভিলাষের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া [illegible] হইয়া থাকে। এই সন্তোষই ধৃতি, তিতিক্ষা, [illegible] প্রভৃতি সকলেরই নামান্তর বা ভাব বিশেষ জ্ঞান ও [illegible] ভগবদ্গীতায় উহারই অনুশীলনার্থ ভূয়োভূয়ঃ [illegible] ওয়া হইয়াছে।

সন্তোষ [illegible]নায় সিদ্ধি লাভ করিলে কীদৃশী অবস্থা হয়? আমরা উহার কি বলিব, কি বুঝিব? যেহেতু, আমরা কখন সুখের ভাবে উৎসিক্ত, আবার কখন দুঃখের তাড়নায় উদ্বেজিত! শুনিয়াছি যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু পতিত হইলে অচিরেই তাহা পড়িয়া যায়, এক কণাও উহাতে লাগিয়া থাকিতে পারে না, ঐরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ও তদ্রূপ দুঃখাকর ভাব ক্ষণকালের জন্যও অধিকার লাভ দূরে থাকুক, প্রবেশ লাভ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

সন্তোষ সাধনের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। ধন

জন প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ের উপর চিত্তের প্রবণতা জন্মিলে, উক্ত নশ্বর বস্তুর ভাবাভাবের উপর জীবের সুখ দুঃখ অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। পরন্তু, অবিনশ্বর পদার্থ কিছু যদি থাকে তৎপ্রতি প্রেম জন্মাইতে পারিলে এক চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, দুঃখ তাহার নিকটে কদাপি আসিতে পারে না। ফলতঃ ভগবদাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যে কি এক অনির্ব্বচনীয় অবিমিশ্র সুখ লাভ করিয়া থাকেন তাহা কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতির বিষয়।

উপরে সুখ লাভ ও দুঃখোৎপাদনের যে যে উপায় উল্লে[illegible]
হইল, তাহা কেবল কয়েকটী স্থূলতম কথা মাত্র। [illegible]
আভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক সুখ ও দুঃখে[illegible]
হইয়াছে, ভৌতিক সুখ দুঃখ, অর্থাৎ শারী[illegible]
সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয়[illegible]
মাত্র বলিলেই হইবে যে, অন্তর্জগতের স[illegible]
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে একের অবস্থান্তরে অ[illegible]
স্তাবী। যাঁহারা সাধনা রাজ্যে কিছু[illegible]
তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, অন্তর্জগতে[illegible]
পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহা[illegible]
করিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না।
[illegible]হ বিকাশ হাস্য ও ক্রন্দন। জগতের[illegible]
শিশুও এই সুখ দুঃখের অধীন, ন[illegible]
দেখিতে পাই কেন? এই সদ্যোজাত[illegible]

প্রথমেই এই সুখ দুঃখের কাহিনী গাহিতে হইল। সহৃদয় পাঠকের নিকট তজ্জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

[সাহিত্য সেবক ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ ১৩১২]



...উহা দেখান ... প্র...
...লিত হই... ভগবদ্...
...ওয়া হইয়া...
...সন্তোষ ... নায় ...
আমরা উহার ... বলিব, কি...
সুখের ভাবে উৎসিক্ত, আব...
শুনিয়াছি যেমন পদ্মপত্রে...
পড়িয়া ...য়, এক কণাও...
ঐরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদ...
জন্যও অধিকার লাভ দূ...
পাবে না।

সন্তোষ সাধনের আর...



सन्मार्ग

सन्मार्ग एव सर्वत्र पूज्यते नापथः कचित्

गुरुवार, श्रावण कृष्ण १ सं० २००५ वि०

मानव-अधिकार

संयुक्त-राष्ट्रसंघने मानव अधिकारोंकी व्याख्या-सहित एक सूची बनानेके लिए ... कई बैठकें ... किया था। ...

...पालनेके मन... किया जा... न्यायालयके समने ... सकता है। ७—प्रत्येक व्यक्ति ... छोड़ने और दूसरेमें बसनेका अधि... ८—वयस्क पुरुष और स्त्री विवाह करने... स्वतन्त्र हैं, बिना दोनोंकी स्वीकृतके वि... हो सकता। समाजका आधार कु... रक्षा होनी चाहिये। ९—प्रत्येक व्यक्तिको अपने विश्वास तथा धर्मकी स्वतन्त्रता है, वह निजी ...सार्वजनिक रूपमें उपासना तथा अन्य धार्मिक कृत्योंका पालन कर सकता है। १०—प्रत्येक व्यक्तिको अपने विचार व्यक्त करनेकी ...

...शिशुकथा
...पदेशः
...वाधकथा
...ब्राह्मणनकुलकृष्णसर्पकथा
...स्तम्भशृगालकथा
...द्रटिट्टिभकथा
...कगर्दभकुक्कुरकथा
मार्जारमूषिककथा

...प्रेम अपने ... चरम सीमा ... —प्रोफेसर जगन्ना...

...হা দেখান য... গ্য প্র...
...লিত হই... ভগবদ...
...ওয়া হইয়া...
সন্তোষ ... নায় ...
আমরা উহার কি বলিব, কি...
সুখের ভাবে উৎসিক্ত, আব...
শুনিয়াছি যেমন পদ্মপত্রে...
পড়িয়া যায়, এক কণাও...
ঐরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃ...
জন্যও অধিকার লাভ দূ...
পাবে না।

সন্তোষ সাধনের আর...